বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ক্যালকাটা পাবলিশার্স । কলিকাতা ১২

প্রচ্ছদশিল্পী। সত্যজিৎ রায়

প্রকাশ কাল। মহালয়া, ১৩৬২

প্রকাশক। মলয়েন্দ্রকুমার সেন

ক্যালকাটা পাবলিশার্স

১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর। মানিকলাল দত্ত।

প্রফুল্ল প্রেস সিণ্ডিকেট,

৯৩/৩/১, বৈঠকখানা রোড

প্রচ্ছদ মুদ্রণ। নিউ প্রাইমা প্রেস।

দাম। দুই টাকা

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের

অমর আত্মার উদ্দেশে—

—এই লেখকের—

পথের পাঁচালী

স্মৃতির রেখা ॥ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

কাল তোমাকে দেখতে পেয়েছি। শেষরাত্রের কাটা চাঁদের ও শুকতারার পেছনে তুমি ছিলে। এই শেষ রাতের আকাশের পেছনে, এই ফুল ফোটা নিমগাছের ডালের সঙ্গে, এই সুন্দর শান্ত ঘন নীল আকাশে এক হয়ে কেমন করে তুমি জড়িয়ে আছ। কত প্রাণী, কত গাছপালার বংশ তৈরী হ'ল, আবার চলে গেল—ঐ যে পায়রাদল উড়ছে, ঐ যে নারকেল গাছটার মাথা ভোরের বাতাসে কাঁপছে, ঐ যে বনমলোর ঝাড় ছাদের আলসেতে জন্মেছে, আমার ছাত্র বিভূতি দু'হাজার বছর আগে এরা সব কোথায় ছিল? দু'হাজার বছর পরেই বা কোথায় থাকবে? এদের সমস্ত ছোটখাটো সুখদুঃখ আনন্দহতাশা নিয়ে ছোট্ট বুদ্বুদের মত অনন্ত গহন গভীর কালসমুদ্রে কোথায় মিলিয়ে যাবে, তার ঠিকানাও মিলবে না—আবার নতুন লোকজন ছেলেপিলে আসবে, আবার নতুন ফুলফলের দল আসবে, আবার নতুন সব সুখদৈন্য হর্ষহতাশা আসবে, কত মিষ্টি জ্যোৎস্নারাত্রির মাধবী বাতাস আবার বইবে, পুরোনো উজ্জয়িনীর কেশধূপবাস যেমন মদির ছিল, ভবিষ্যৎ কোন বিলাস-উজ্জয়িনীতে নতুন কেশরাশি পুরোনো দিনের চেয়ে কিছু কম মদির হয়ে উঠবে না, কত গ্রাম্য-নদী ভবিষ্যতের অনাগত গ্রাম-বধূদের সুখদুঃখ সম্ভার নিয়ে বয়ে চলবে···আবার এরা যাবে, আবার নতুন দল আসবে।

কিন্তু তুমি ঠিক আছ। হে অনন্ত, যুগে যুগে তুমি কখনো বদলে যাও না। সমস্ত পরিবর্ত্তন বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে, সমস্ত ধ্বংস-সৃষ্টির মধ্য দিয়ে অপরিবর্ত্তিত, অনাহত তুমি যুগ থেকে যুগান্তরে চলেছ। এই দৃশ্যমান পৃথিবী যখন আকাশে জ্বলন্ত বাষ্পপিণ্ড ছিল, তারও কত অনন্তকাল পূর্ব্ব থেকে তুমি আছ, এই পৃথিবী যখন আবার কোন দূর অনির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যতে, যখন আবার জড় পদার্থের টুকরোতে রূপান্তরিত হয়ে দিকহারা উল্কার গতিতে উদভ্রান্ত হয়ে অনন্ত ব্যোমে ছোটাছুটি করবে, তখনও তুমি থাকবে। কালের অতীত, সীমার অতীত, জ্ঞানের অতীত কে তুমি—তোমাকে চেনা যায় না। অথচ মনে হয়,

এই যেন বুঝলাম, এই যেন চিনলাম। শেষ রাত্রের নদীর জলে যখন চিকচিকে মিষ্টি জ্যোৎস্না পড়ে, শেওলায় কূলে তাল দেয়, তখন মনে হয় সেখানে তুমি আছ, ছোট্ট ছেলে তার কচি মুখ নিয়ে ভুরভুরে কচিগন্ধ সমস্ত গায়ে মেখে যখন নরম হাতদুটি দিয়ে গলা জড়িয়ে ধরে যেন মনে হয় সেখানে তুমি আছ, ওরায়ণ যখন পৃথিবীর গতিতে সমস্ত রাত্রির পরে দূর পশ্চিম আকাশে ঝুলে পড়ে, সেই রুদ্র প্রচণ্ড অথচ না-ধরা-দেওয়া-গতির বেগে তুমি আছ, জনহীন মাঠের ধারে গ্রাম্য ফুলের দল যখন ঠাসাঠাসি করে দাঁড়িয়ে অকারণে হাসে তখন মনে হয় তাদের সেই সরল প্রাণের প্রাচুর্য্য, তার মধ্যে তুমি আছ।

তাই বলছিলাম যে কাল শেষরাত্রে তোমাকে হঠাৎ দেখলাম। অন্ধকার প্রহরের শেষ রাত্রের চাঁদ ও তার পার্শ্ববর্ত্তী শুকতারার পেছনে। তোমায় প্রণাম করি—

আজ কলেজের কালভার্ট বেয়ে উঠছিলাম। বেলা পাঁচটা, ঠিক সন্ধ্যেটা হয়ে এসেছে, ছোট ছোট সেই অজানা রাঙা ফলগাছগুলোর দিকে চেয়ে কেমন হঠাৎ আনন্দ এসে পৌঁছালো—নাথনগরের আমগাছগুলোর ওপর সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে, কেমন রাঙা হয়ে উঠেছে সেদিকের আকাশটা—এই সামান্য জিনিষের আনন্দ, কচিমুখের অকারণ হাসি, রাঙা ফলগাছটা, নীল আকাশের প্রথম তারা, ঐ যে পাখীটা বাঁকা ডালে বসে আছে, সবশুদ্ধ মিলে এক এক সময় জীবনের কেমন গভীর আনন্দ এক এক মুহূর্ত্তে আসে।

মানুষ এই আনন্দ জানতে না পেরেই অসুখে, হিংসায়, স্বার্থদ্বন্দ্বে সুখ খুঁজতে গিয়ে নিজেকে আরও অসুখী করে তোলে...আজ যে মার্টিন লুথারের জীবনী পড়ছিলাম, তাতে মনে হোল এক এক সময় এক-একজন ব্রাত্যমন নিয়ে পৃথিবীতে এসে শুধু যে নিজেই স্বাধীন মত ব্যক্ত করে চলে যায় তা নয়, জড়মনকেও বন্ধন-মুক্ত করে দেবার সাহায্য করে। যেমন সহস্র বৎসরের পুঞ্জীকৃত অন্ধকার এক মুহূর্ত্তের একটা দেশলাইয়ের কাঠির আলোতেই চলে যায়—তেমনি।

কাউকে ঘৃণা করতে হবে না। এ জগতে যারা হিংসুক, স্বার্থান্ধ, নীচমনা তাদের আমরা যেন ঘৃণা না করি···শুধু উচ্চ জীবনানন্দ তাদের দেখিয়ে দেবার কেউ নেই বলেই তারা ঐ রকম হয়ে আছে। কোন্ মুক্ত পুরুষ অনন্ত অধিকারের বার্ত্তা তাদের উপেক্ষিত বুভুক্ষাশীর্ণ প্রাণে পৌঁছে দেবে?

॥ ২৭শে অক্টোবর, ১৯২৪, কলিকাতা ॥

হঠাৎ পুরোনো দিনগুলো মনে এল। মনে এল কতকগুলি ছায়াভরা বৈকাল, কতকগুলি সুন্দর জ্যোৎস্নাভরা রাত্রির সন্ধ্যা, সবগুলিই কেমন গভীর, অনন্ত, রহস্যময়। সময় তাদের দু'পাশ বেয়ে ছুটে চলে তাদের কোন দূরে নিয়ে ফেলেছে···যেমন ভবিষ্যতও মানুষের মনে বড় গভীর ও অনন্ত বলে মনে হয়, অতীতও অল্পদিনের হলেও তার চেয়েও গভীর বলে মনে হয়, রহস্যময় বলে মনে লাগে, হারিয়ে যাওয়ার গভীরতা মাখানো রহস্য তাদের অঙ্গে অঙ্গে জড়ানো—অনেকদিন হ'ল প্রাচীন অতীতে মিশে গেলেও তাদের গন্ধ, শব্দ, রূপ এখনও আমার মনের মধ্যেই আছে। মনের যেখানে তাদের আশ্রম, একদিন কিসে বলা যায় না হঠাৎ সেই তারে ঘা পড়ে যায়, তখন অতীত মুহূর্তগুলি তাদের অতীত গন্ধে রূপে বর্ণে শব্দে, সুখে দুঃখে, হাসি অশ্রুতে, আশায় নিরাশায়, মঙ্গল অমঙ্গলে, সৌন্দর্য্যে রসে একেবারে প্রত্যক্ষ বাস্তব হয়ে মুহূর্ত্তের জন্য উদয় হয়। কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্য, তারপরই আবার চোখের ভ্রমজালের মত পরমুহূর্ত্তেই মিলিয়ে যায়—

।। ২৯শে এপ্রিল, ১৯২৫, ভাগলপুর ।।

হঠাৎ যেন মনে হ'ল হাজার বছর আগে যে সব পাখী বনে বনে গান গেয়ে চলে গিয়েছে, আজ এই ছায়াভরা সন্ধ্যায় তারাই যেন আবার কোথা থেকে গেয়ে উঠলো। যে সব ছেলেমেয়েরা হাজার বছর আগে মা-বাপের কোলে মিষ্টি হাসি হেসে কতদিন হ'ল ছেলেবেলায় দেখা স্বপ্নের মত কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে, আজ সন্ধ্যায় সেই সব অস্পষ্ট দূর অতীতের ছেলেপিলের মিলিয়ে যাওয়া হাসিরাশি—নদীর ধারে বনে বনে মাঠে মাঠে—ঝোপে ঝোপে—ফুল হয়ে ফুটে গোধূলির আঁধার আলো করে আছে।

তার ক্ষুদ্র জগতে সন্ধ্যা হয়ে এলো। রায়েদের কাঁটালতলায়, পুকুর-ধারে, টুনুদের উঠানে, নেড়াদের বাড়ীর সামনের বড় গাছটার তলায়, অন্ধকার হয়ে এলো, খেলাঘরের ক্ষুদ্র জগতের চারদিক অন্ধকার হয়ে এলো।

জগতের অসংখ্য আনন্দের ভাণ্ডার উন্মুক্ত আছে। গাছপালা, ফুল, পাখী, উদার মাঠঘাট, সময়, নক্ষত্র, সন্ধ্যা, জ্যোৎস্না রাত্রি, অস্তসূর্য্যের আলোয় রাঙা নদীতীর, অন্ধকার নক্ষত্রময়ী উদার শূন্য···এসব জিনিস থেকে এমন সব বিপুল, অবক্তব্য আনন্দ, অনন্ত উদার মহিমা প্রাণে আসতে পারে—সহস্র বৎসর ধরে তুচ্ছ জাগতিক বস্তু নিয়ে মত্ত থাকলেও সে বিরাট,

অসীম, শান্ত উল্লাসের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই কোন জ্ঞান পৌঁছয় না। জগতের শতকরা নিরানব্বই জন লোক এ আনন্দের অস্তিত্ব সম্বন্ধে মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত অনভিজ্ঞই থেকে যায়—শতবর্ষজীবী হলেও পায় না ··অনুরূপ শিক্ষা, সাহচর্য্য, আদর্শ, যে রূপ আনন্দের পথ দেখিয়ে দেবার জন্য প্রয়োজন হয়, দুর্ভাগ্যক্রমে তা সকলের জোটে না।

সাহিত্যিকদের কাজ হচ্ছে এই আনন্দের বার্ত্তা সাধারণের প্রাণে পৌঁছে দেওয়া। তারা ভগবানের প্রেরণা নিয়ে এই মহতী আনন্দবার্ত্তা, এই অনন্ত জীবনের বাণী শোনাতে জগতে এসেছে এই কাজ তাদের করতে হবেই—তাদের অস্তিত্বের এই শুধু সার্থকতা···

॥ ৩০শে এপ্রিল, ১৯২৫, ভাগলপুর ॥

আজ বসে বসে অনাগত দূর ভবিষ্যতের ছেলেমেয়েদের কথা মনে পড়ছে। তাদের কচি কচি মুখ, তাদের হাসি, তাদের পাগলামি, তাদের সরল শিশু চোখের দুষ্টুমির চাউনি, হাজারে হাজারে, লাখে লাখে মনে পড়ছে—ফুলের মত মুখে কচি ফুলের মত হাসি···আমার সেই সব অনাগত শিশু প্রপৌত্র, বৃদ্ধপ্রপৌত্র ও অতিবৃদ্ধ-প্রপৌত্রদের জন্য কি রেখে যাব তাই ভাবছি। আগামী হাজার বছরের মধ্যে লাখে লাখে, কোটিতে কোটিতে কত শিশুফুল ফুটে উঠছে নির্ম্মল শুভ্র হাসিভরা সুন্দর সৌম্য মেশামেশি গলাগলি করে—তারা সব একসঙ্গে যেন পরস্পর ঠেলাঠেলি করতে করতে তাদের শিশুমুখগুলি তুলে, অজস্র খইয়ের মত ফোটা ঘেঁটুফুলের দলের মত—নীল আকাশে অনাদি অনন্ত কালের রঙের খেলার নীচে -চিরযুগব্যাপী অপরাহ্নের শান্ত ছায়াভরা মাঠে বসন্তের হাসি দেখছে···ওদের দেখতে পাচ্ছি বেশ—ওরা আসবে, আসবে।

অনন্ত মেঘভরা আকাশে এখানে ওখানে দু'একটা তারা দেখা যাচ্ছে। এই সামান্য দুদিনের অতি একঘেয়ে সঙ্কীর্ণ পৃথিবীর জীবন ফুরিয়ে গেলে মনে হয় ওরাই আমাদের ভবিষ্যৎ ঘরদোর হবে। হয়ত ওদের অদৃশ্য সাথী তারাগুলো, বড় বড় বিশ্ব, কত সভ্যতা, কত নতুন প্রাণী, নতুন বিবর্ত্তন ওগুলোর মধ্যে। কত স্নেহ ভালবাসা প্রেম জ্ঞান স্মৃতি প্রীতি, কত নতুনতর জীবনযাত্রা, কত অভিজ্ঞতা, কত বিচিত্রতা ওদের জগতে আছে, কে জানে! এই পার্থিব অস্তিত্বের ওপারে সেই সব নতুনতর জীবন হয়ত আমাদের জন্যে

অদৃশ্যভাবে অপেক্ষা করছে—এই পরিদৃশ্যমান নক্ষত্রজগতের থেকেও কোটি কোটি আলোকবর্ষ দূরে। ব্রহ্মাণ্ডের কোন্ দূরতম প্রান্তের মোহানায় হয়ত আরও কত লক্ষ বিশ্ব আছে। তাদের প্রত্যেকটিতে হয়ত কত নতুন সূর্য্য, নতুন গ্রহ, নতুন নক্ষত্রমণ্ডল আছে। কত নতুন প্রাণী, কত বিচিত্র জীবনযাত্রার ইতিহাস, কত কল্পনার সম্পূর্ণ অতীত ভাবের লীলা, সে সব দূর বিশ্বের চিরদিনের সম্পত্তি কে জানে ?

এই জীবনের ওপারে সেই বিরাট জীবনের জন্যে সকলে অপেক্ষায় থাকুক।

॥ ২২শে জুন, ১৯২৫, ভাগলপুর ॥

এখন থেকে বিশ কি ত্রিশ হাজার বছর পরের কথা। এই প্রকাণ্ড কলকাতা সহরের ওপরে কয়েক শত ফিট পলি জমে গিয়েছে, মনুমেণ্টের চূড়োটারও অনেক উপর পর্য্যন্ত মাটি জমে গিয়েছে, তার উপর দিয়ে এক বিরাট বিশাল মহাসমুদ্র প্রবাহিত হচ্ছে, কত মাছ, কত প্রবাল কত ভীষণদর্শন সব সামুদ্রিকপ্রাণী তার কুক্ষির মধ্যে ··

অনাগত সেই সুদূর ভবিষ্যতের দুটি মানুষ একটা জাহাজে চড়ে সমুদ্রযাত্রা করছে, একটি বালক, বয়স দশ এগার বৎসর। অপরটি তার এক আত্মীয়, প্রৌঢ়। নিজের দেশ ছেড়ে তারা বিদেশে চলেছে. জীবিকার্জ্জনের আশায়। প্রৌঢ় তার আবাল্য সহচরদের ছেড়ে চলেছে, মনে কত কষ্ট হচ্ছে। বহু পুরাতন পিতৃপিতামহদের পুণ্যপাদপূত জন্মভিটা ছেড়ে যাচ্ছে। কাজেই চিরপরিচিত স্থান আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব ছেড়ে যাবার দুঃখে সে চুপচাপ উদাসভাবে জাহাজের রেলিং-এর ধারে দাঁড়িয়ে দূরে ক্রমবিলীনমান শ্যাম তটভূমির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। ছোট্ট ছেলেটি সবে বছর দশেক হল পৃথিবীতে এসেছে। তার মধ্যে বছর পাঁচেক তো তার জ্ঞানই হয়নি। অতএব সবে বছর পাঁচেক হল তার দেখবার শুনবার চোখকান ফুটেছে মাত্র—সে চঞ্চলভাবে এদিকে ওদিকে চাইছে···আঙুল দিয়ে উৎসাহপূর্ণস্বরে এটা ওটা দেখিয়ে বলছে—"ঐ দ্যাখো কাকাবাবু, কেমন পাহাড়টা—ঐ দ্যাখো, ওটা কি ?—পাহাড়ের ওপর বন ? বাঃ বেশ তো ? ঐ দ্যাখো, কাকাবাবু কেমন একটা পাখী"—প্রৌঢ় বসে বসে ভাবছে অমুকের কাছে যে দেনাটা ছিল সেটা আদায় করে আসবার কোনো ব্যবস্থা হয় নি। বড় ভুল হয়ে গেছে তো ! অমুকের জমিটার দর আর একটু বেশী দিলে হয়তো দিয়ে দিত—জমিজমা এই সময় না কিনলে-কাটলে

ভবিষ্যতে কি করে ছেলেপিলেদের চলবে? তার প্রপিতামহ কোন প্রাচীনকালে যে জমিজমা করে রেখে গেছেন তাতেই এখনও চলছে—সে-সব কি আজকের কথা! তখন সত্যযুগ ছিল, অমুকের দর শুনেছি অমুক ছিল। আর এখন! বাপরে, আগুন, ছোঁয়াও যায় না। (দীর্ঘনিঃশ্বাস)···ছেলেটা এই সময় জিজ্ঞাসা করলে—কাকাবাবু, আমরা যে অমুক সহরে যাচ্ছি সেটা কি খুব বড় জায়গা?

—ওঃ কত বড় জায়গা তা দেখিস—পাড়াগাঁয়ের মধ্যে ও-রকম জায়গা কোথায়?

—কাকাবাবু, সহরটা কি খুব পুরোনো?

কাকাবাবু (মুরুব্বিয়ানার হাস্যে)—হিঃ হিঃ, বলে কিনা খুব পুরোনো? ওরে পাগলা, আমার প্রপিতামহ অমুক যখন অমুক জায়গায় দেওয়ান ছিলেন, তখনও ঐ সহর এত বড়ই ছিল···তবে তার চেয়ে এখন অবিশ্যি আরও ঢের উন্নতি হয়েছে। ওসহর আরও পুরোনো- -কত পুরোনো তা বলা যায়না, মোটের ওপর অনেক অনেক কালের প্রাচীন জায়গা···

তাদের সমস্ত কথাবার্ত্তার সময় অনাগত ভবিষ্যতের এই দুটি নতুন মানুষ জানতো না তাদের জাহাজ যে সমুদ্র বেয়ে যাচ্ছে তার নীচে, অনেক অনেক নীচে, বালি কাদা খোলা পাথর উদ্ভিজ্জ পচা এঁটেল মাটীর স্তরের নীচে, ভিন্ন যুগের এক বিশাল সহর, তার মেমোরিয়াল মনুমেণ্ট প্রাসাদ অট্টালিকা চত্বর বিদ্যালয় গৃহস্থ বাটী বাগান আশা ভরসা সুখ দুঃখ নিয়ে সবশুদ্ধ একেবারে পুঁতে গিয়ে চাপা পড়ে রয়েছে। হয়ত সেই দশবছরের ছেলেটি তার কোনো দূর জন্মান্তরে সেই সহরের অধিবাসী ছিল, কোনো বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিল, কত সাথী, কত বন্ধু, কত তরুণী—কত প্রেম, কত স্নেহ···সে কি জানে সে পৃথিবীতে নতুন আসেনি? তিনশত ফিট নীচে মহাসমুদ্রের তলের কয়েক ফিট নীচে, বালি কাদা উদ্ভিজ্জ পচা মাটি-স্তূপের নীচের সুদূর, বহুপ্রাচীন, বিস্মৃত অন্ধকার অতীতের এক বিলুপ্ত জগতে তার একবারের জীবন কেটেছে····এমনি সুখ আশা, সুখ দুঃখেই কেটেছে, যা তার কাছে আজ নতুন লাগছে। তার সেই প্রাচীন, সুদূর অস্তিত্বের মধ্যে আর বর্ত্তমান নতুন জীবনকোরকের কচি দলগুলির মধ্যে এক বিরাট মহাসমুদ্র, কয়েকশত ফিট পচা কাদার স্তর, আর সহস্র সহস্র বৎসরের এক বিরাট যবনিকা পড়ে রয়েছে।

সামনের সাদা ঐ মেঘ-ভরা আকাশ, প্রভাতের নবোদিত সোনার সূর্য্যকিরণ, নীল পাহাড়ের উপরকারের প্রভাতকিরণসমুজ্জ্বল বনশোভা, শরতের শান্ত রৌদ্র-

লীলা যে এক অদ্ভুত আশ্চর্য্য জগতের আভাস দিচ্ছে, এই সব পরিচিত, প্রাচীন, সনাতন এবং অতি একঘেয়ে বলে মনে হওয়া জগতের পিছনে যে কি বিরাট পরিবর্ত্তনের গতির উদ্দাম নৃত্যের ভাঙাগড়ার খামখেয়ালী লীলা চলেছে, কি অবাধ মুক্ত লীলাচঞ্চল দৃঢ় জীবনস্রোত বেয়ে চলেছে, দুদিনের জীবনে যাকে একঘেয়ে চিরপুরাতন বলে মনে হচ্ছে, সে যে কি বিরাট চঞ্চল, কি গতিশীল, কি প্রচণ্ড, কি রোমান্স যে তার পিছনে, সে কথা ওই নব-আগন্তুক অপরিপক্কবুদ্ধি শিশু কি বোঝে?

সে শুধু চেয়ে আছে। তার মুগ্ধ, আনন্দদীপ্ত শিশুনয়ন দুটি তুলে সমুদ্রের মধ্যের ছোট পাহাড়ের দিকে চেয়ে আছে, যার চূড়ায় কোন্ এক ধনীর মস্ত একটা সাদারঙের প্রাসাদ আর নীচে জেলেরা চড়ায় ছোট নৌকা নিয়ে মাছ ধরছে।

"পুরা যত্র স্রোতঃ পুলিনমধুনা তত্র সরিতম্"

প্রাচীন যুগের অধুনাতন লুপ্ত যে মহাসমুদ্র প্রাচীন পৃথিবীর পৃষ্ঠে হাজার হাজার লুপ্ত জন্তু বুকে করে প্রবাহিত হ'ত, সেই প্রাচীন মহাসমুদ্রের তীরে যেন এরা চুপ করে বসে থাকতো। তাদের মাথার উপরকারের নীল আকাশে অহরহ পরিবর্ত্তনশীল মেঘস্তূপের মত চঞ্চল এই বিশ্ব তার প্রাচীন আদিমযুগের লতাপাতা, জীবজন্তুসহ তাদের চারধারে এমনি করেই মায়াপুরী রচনা করে রইত! এমনি প্রভাতে সূর্য্যের আলো প্রাচীন যুগের সাগরবেলায় পড়তো। আর প্রভাত-সূর্য্যের আলো এমনই শীকরসিক্ত প্রাচীন ধরনের ঝিনুক শাঁক কড়ি পলার ওপরে রামধনুর রং ফলাতো। সবশুদ্ধ নিয়ে প্রাচীন মহাসমুদ্রের বেলাভূমি আজকাল অন্ধকার খনি-গর্ভে চুনাপাথর বা বেলেপাথরে রূপান্তরিত হয়ে আছে। মহাকালের গহন-গভীর রহস্যের নৃত্য-ক্ষুব্ধ চরণচিহ্নের মত।

॥ ২৯শে জুলাই, ১৯২৫, কলকাতা ॥

অন্ধকার সন্ধ্যা। বর্ষার মেঘে মেঘে আকাশ ছাওয়া। জলার ধারে বনে বড় বড় তাল গাছগুলো অল্প অল্প বার হওয়া তুঁতে রঙের আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে আছে। বর্ষার জলে সতেজ ঘন সবুজ ঝোপঝাপ, গাছপালায় বর্ষণক্লান্ত ভাদ্র সন্ধ্যায় মেঘান্ধকার ঘনিয়ে আসছে···এখানে ওখানে জোনাকির দল জ্বলছে, জলের ধারে কচুবনে ব্যাং ডাকছে, আকাশে এক ফালি চাঁদ উঠেছে, চারিদিক নীরব, কোনো দিকে কোনো শব্দ নেই।

দেখে বসে বসে মনে হ'ল যেন সৃষ্টির আদিম যুগের এক জলার ধারে বসে আছি। যে জলার ধারের বনগাছ এখন প্রস্তরীভূত হয়ে পাথুরে কয়লায় রূপান্তরিত হয়েছে—সেই পঞ্চাশ ষাট লক্ষ বা কোটি বৎসর আগেকার এক প্রাচীন আদিম পৃথিবীর জলার ধারে···চারধারের গাছপালাগুলো আদিম ধরনের সাদাসিধা গাছপালা···Stigmaria, Sigiloria, Lepidodendren longifolium ইত্যাদি। পৃথিবী জনহীন, মনুষ্য সৃষ্টির বহু বহু পূর্ব্বের পৃথিবী এ। আদিম গহন গভীর অন্ধকার অরণ্যে শুধু আদিম যুগের অতিকায় অধুনালুপ্ত Saurianরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। পাখী নেই, ফুল নেই, মানুষ নেই, সৃষ্টির কোনো সৌন্দর্য্য নেই আকাশে, অথচ প্রতিদিন সুন্দর সোনার সূর্য্যাস্ত হচ্ছে। প্রতি রাত্রে রূপোলী চাঁদের আলোর ঢেউ আদিম অরণ্য আর জলার বুকে বেয়ে যাচ্ছে। দেখবার কেউ নেই, বুঝবার কেউ নেই। কতদিন পরে মানুষ আসবে, পৃথিবী যেন সেজন্যে উন্মুখী হয়ে আছে—সে আসবে তবে তার শিল্পকলা সঙ্গীত কবিতা চিত্রে ধ্যানে উপাসনায় চিন্তায় প্রেমে আশায় স্নেহে মায়ায় পৃথিবীর জন্ম সার্থক হবে। অনাগত সে আদুরে ছেলেটির জন্যে পৃথিবীমায়ের বুকটি তৃষিত হয়ে আছে।

কিন্তু ছেলেটি যখন এলো, তখনই কি দেখলে, না সকলে দেখে? ঐ যে অন্ধকার বনের উপরের মেঘান্ধকার স্তব্ধ আকাশে, ছিন্নভিন্ন মেঘের ফাঁক দিয়ে তৃতীয়ার চাঁদটুকু দেখা যাচ্ছে, কে ওর মর্ম বোঝে? তাই মনে হয় ভগবান যেন মাঝে মাঝে দুঃখ করেন। তাঁর এই বিপুল রহস্যে ভরা সৃষ্টির সৌন্দর্য্য ভাল করে বুঝলে বা বুঝতে চেষ্টা করলে এমন লোক খুব কম। তিনি যে যুগ যুগ ধরে তপস্যার পর শান্ত মৃত্যুঞ্জয়, অমৃতরস মন্থন করে তুললেন—এই বিরাট, বিদ্রোহী, জড়-সমুদ্র মন্থন করে······, তাঁর অনন্ত যুগের তপস্যার ফল এই অমৃত কেউ পান করলে না, কেউ আগ্রহ দেখালে না পান করবার। কোন্ যে তাঁর বরপুত্রেরা মাঝে মাঝে পৃথিবীতে পথ ভুলে এসে পড়ে, তারা এ জগতের তুচ্ছ জিনিষে ভোলে না, তাদের মন পৃথিবীর সুখ দুঃখ ভোগলালসার অনেক ঊর্দ্ধে, ঐ অমৃতলোকে, ঐ cosmic সৌন্দর্য্যে ডুবে আছে, অনেক বড় vision তারা দ্যাখে, সকলের জন্যে বিজ্ঞানে ও জ্ঞানে, গানে কবিতায়, ছবিতে কথায় লিখেও রেখে যায়, কিন্তু তাদের কথা শোনে বোঝে খুব কম লোকেই—তার চেয়ে সুদের হিসেব কসলে ঢের বেশী আনন্দ এরা পায়।

॥ ২২শে আগষ্ট, ১৯২৫, ভাগলপুর ॥

সব ছোট্ট ছোট্ট ছেলেমেয়েগুলি পৃথিবীতে নেমে আসছে, নীল অকূল থেকে পৃথিবীর মাটীর তীরে। মুখে তাদের প্রাণ-কাড়া দুষ্টুমির হাসি, চোখে দেবদূতের সরলতা। কোঁকড়া চুলে ঘেরা টুক্‌টুকে মুখগুলি—সকলেরই হাতে তাদের ছোট্ট ছোট্ট সব মশাল।

চন্দন কাঠের তৈরী চন্দন কাঠের গুঁড়ো দিয়ে মশলা বাঁধা মশালগুলি, জ্বললে গন্ধে দিক আমোদ করে।

ওদের দিকে কেউ চাইছে না। বাঁশবনের অন্ধকার ছায়ায় সারাদিন ওদের কাটল, রাত আসছে, কিন্তু ওদের মশালগুলো কে জ্বালবে?

অনেক লোকে জ্বালতে এল, কেউ জ্বেলে দিয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেল, নিবে যে গেল তা পিছন ফিরে চেয়েও দেখলে না। কেউ বহুবার চেষ্টা করেও জ্বালতে পারলে না, কেউ চেষ্টা করলে না জ্বালবার। কেউ চোখ নীচু করে চেয়েও দেখল না যে শিশুদের হাতে মশাল আছে।

অথচ সব সময় শিশুরা অনন্ত নিস্তরঙ্গ মিনতিভরা চোখে চেয়ে রয়েছে সকলেরই দিকে, কে তাদের মশাল জ্বেলে দেবে? কে সে নিপুণ অথচ প্রেমিক মশালচী?

কত শিশু বুঝতে না পেরে আশাভঙ্গ হয়ে নিজেদের হাতের মশাল ফেলে দিলে, হয়ত যা জ্বলতে পারত অতি সুন্দর, যুগ যুগ ধরে বিশ্বের দিগ্‌দিগন্ত যে সৌরভে আকুল হয়ে উঠত, তা অনাদৃত হয়ে পড়ল কাদায়। অবোধ শিশুদের বলে দেবার, দেখিয়ে দেবার, মশাল তুলে জ্বেলে দেবার তো কেউ নেই।

গহন অরণ্যের অন্ধকার বীথি বেয়ে কে একজন আসছে। বাঁশবনের ছায়া স্নিগ্ধ হয়েছে কার সুন্দর মুখের হাসিতে? তার হাতে মস্ত বড় মশাল, শুভ্র আলোয় সমস্ত অন্ধকার আলো হয়ে গেল এক মুহূর্তে।

গহনান্ধকার বেণুবীথির অজানা ওপার থেকে সে এসেছে, চিররাত্রির অন্ধকার দূর করতে। ভগবানের বিশ্বের সে এক মশালচী—

আয়রে, আয় আয়, আয়।

হাসি মুখে কোঁকড়ান চুল দুলিয়ে, আলোর জ্যোতিতে আকৃষ্ট হয়ে শিশু-পতঙ্গের দল সব ছুটে এল ওদের ছোট্ট ছোট্ট চন্দন-মশলায় বাঁধা মশাল হাতে নিয়ে। চারধার ঘিরে কাড়াকাড়ি, সবাই আগে চায়।

কত ধৈর্য্যের সঙ্গে নতুন মশালচী আলো জ্বালতে লাগল, যাদের নিবে যাচ্ছিল তাদের বার বার ফুঁ দিয়ে কত অসীম ধৈর্য্যের সঙ্গে। সকলেরই জ্বলল।

ছোট্ট ছোট্ট জলন্ত মশাল হাতে শিশুরা নাচতে নাচতে আনন্দভরা হাসিমুখে অন্ধকার কুঞ্জপথের এদিকে ওদিকে বেরিয়ে কোথায় সব চলে গেল। আর কোথাও কেউ নেই। অপর কোন অরণ্যাণীর গহন নীরব পুঞ্জীভুত অন্ধকার দূর করতে, অপর কোন অনাগত বংশধরদের হাতের মশাল অমনি করে জ্বেলে দিতে। নিত্যকালের ওরা হ'ল যে মশালচী।

॥ ভাগলপুর, ২৮শে আগষ্ট, ১৯২৫ ॥

পনের বৎসর আগের এক সন্ধ্যা হঠাৎ বড স্পষ্ট হয়ে মনে পড়লো। বাড়ীর পিছনের বড কাটালগাছটার রাঙা শেষ সূর্য্যাস্তের রোদটুকু লেগে আছে গাছে পাতায়, বাঁশবনে, কাটালগাছের তলায়। পথের ধারের শেওড়াবনে অন্ধকার নেমে আসছে, ঝিঁঝিঁপোকা ডাকছে, পাচীলের পুরোনো কোন্ কোণে, মাটির ঘরের দাওয়ায়, খড়ের চালের নীচে। সন্ধ্যায় শাঁক বেজে উঠলো, চারধারে কাক, ছাতারে, ঘুঘু, নীলকণ্ঠ, শালিখ পাখীরা ছায়াভরা আকাশ বেয়ে বাসায় ফিরছে—তখনকার সেই দিনটির আশা আনন্দ আকাঙ্খা আকুল আগ্রহ—

আজকের এই সন্ধ্যায় আকাশটির রং যেমন মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বদলাচ্ছে, কোথাও ওই তুঁতের রং এখনই কালো হয়ে উঠছে, কোথায়ও রোদের সোনার রং ধূসর হয়ে গেল। মেঘের পাহাড় সমুদ্র হয়ে যাচ্ছে, সমুদ্র দেখতে দেখতে পাহাড় হয়ে উঠল। রক্তের পুকুর চোখের সামনে নীল মাঠ হয়ে যাচ্ছে! পৃথিবীটাও ঐ রকম মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তনশীল—সূর্য্যাস্তের এই আকাশে যেমন মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বহুরূপীর মত রং বদলাচ্ছে ঠিক ঐ রকমই আকাশ যেন একটা মস্ত দর্পণ—পৃথিবীর এই অহরহ পরিবর্ত্তনশীল রূপ ওতে যেন সব সময় ধরা পড়ছে। তাই সেটাও একটা বিরাট ছায়াবাজীর মত দেখা যায়।

তরল আনন্দ আধ্যাত্ম জীবনের পরিপন্থী নয়। Sadness আসে না জীবনের একটা বড অমূল্য উপকরণ—Sadness ভিন্ন জীবনে profundity —যেমন গাঢ অন্ধকার রাত্রে আকাশের তারা সংখ্যায় ও উজ্জলতায় অনেক বেশী হয়, তেমনই বিষাদবিদ্ধ প্রাণের গহন গভীর গোপন আকাশে সত্যের নক্ষত্রগুলি স্বতঃস্ফূর্ত্ত ও জ্যোতিষ্মান হয়ে প্রকাশ পায়—তরল জীবনানন্দের পূর্ণ জ্যোৎস্নায় হয়ত তারা চিরকালই অপ্রকাশ থেকে যেত। সেই হিসাবে এই emotional sadness জীবনের একটা খুব বড় সম্পদ।

॥ ২৮শে আগষ্ট, ১৯২৫ ॥

এ প্রশ্ন একদিন নিউটনের, কেপ্‌লারের, গ্যালিলিওর মনে উদয় হয়েছিল। সকলেরই মনে এ প্রশ্ন উদয় হওয়া উচিৎ। জগতে দুদিনের জন্যে আসা—এই জগতের ফলে, জলে, স্নেহে, দয়ায় মানুষ হয়ে এটা কি উচিৎ নয় যে জগতের জন্যে কিছু করে যাবো? আমার ছাত্রটি যেমন কচি, সুন্দর, ঐ রকম অবোধ শত শত অনাগত শিশু-মনের জন্যে উত্তরকালে আমার কি দেবার থাকবে? আমি বেশ কল্পনা করতে পারি, শত শত কি সহস্র বৎসর পরেও এমন কেউ কেউ ওদের মধ্যে থাকবে যে হয়তো বনে, শান্ত পর্ব্বতের ছায়ায়, নির্জ্জন সন্ধ্যায়, শান্তিপূর্ণ কোনো গ্রাম্য নদীতীরে, অথবা অন্ধকার গহন-রাত্রে শিশিরভেজা ঘাসের উপর, তারার আলোয় শুয়ে ওরা এইগুলি পড়বে আর মনে আনন্দ, বল, উৎসাহ আলো পাবে এইতো জনসেবা, পৃথিবীতে এসে এই করেই তে সার্থকতা—একশত বৎসর পরে আমার নাম দশ বৎসর আগেকার পাতা মাকড়সার জালের মত কোথায় কালসাগরে মিলিয়ে যাবে—তবে কি রেখে যাবো আমার দুঃখের মত দুঃখী ঐ সব অনাগত কচি কচি শিশু মনগুলির খোরাকের জন্যে? কি রেখে যাবো? কি সম্পত্তি কি heritage তাদের জন্যে দেবো?

শান্ত, আঁধার অপরাহ্নে বাড়ীর পিছনের বন যখন সন্ধ্যার অন্ধকারে ঢেকে আসে, পুরোনো নোনাধরা দেওয়ালের কোণে যখন বাদুড়ের দল ছটপাট করতে শুরু করে, নদীর ওপারে শিমুলগাছের মাথা থেকে শেষ বৈকালের ম্লান রোদের ছায়াও যখন মিলিয়ে যায়, তখন বহু দূর, দূর ভবিষ্যতের রাশি রাশি ফুলের মত মুখ, শিরীষের পাপড়ীর মত নরম এই সব অনাগত বংশধরগণের কথা পড়ে। এই সন্ধ্যার মত অন্ধকারও ওদের মধ্যে কত ছেলের জীবনে আসবে। সন্ধ্যায় এখন আকাশে যেমন জলজ্বলে শুকতারা সন্ধ্যা হবার সঙ্গে সঙ্গেই আসে আবার সূর্য্যের প্রথম আলোর আগেই মিলিয়ে যায়, ওদের জীবনেও অমনি দুঃখরাত্রের সত্যের উজ্জ্বল শুকতারা যদি না ফোটে তো কে তাদের আশা দেবে? তাই কিছু করে যেতে হবে—জীবনটা ছেলেখেলার জিনিষ নয়। এটা একটা serious জিনিষ। যারা হেসে খেলে তুচ্ছ আমোদ প্রমোদে স্ফূর্ত্তি করে কাটালে তাদের কথা ধরিনা, কিন্তু যারা জীবনটাকে serious ভাবে নিতে যায়, নিঃস্বার্থ ভাবে নিজের সুখ না দেখে, তাদের উচিৎ এই উত্তরকালের শিশু, বৃদ্ধপৌত্র, অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্রগণের জন্য কিছু সঞ্চয় করে যাওয়া।

এতে আপন পর কিছু নেই, কি তুমি দেবে এদের? এদের জন্যে কি রাখছ তুমি? জীবনের mission কি তুমি অবহেলা করবে? উপেক্ষা করে ভগবানের পবিত্র মহৎ দানকে পায়ে দলে যাবে?

কোনো কাজ কর বললেই করা হয় না, এ জিনিষ সহজ নয়। অনেকদিন ধরে ভাবতে হয়, বাইরের কোনো জিনিষ থেকে বাধা বিঘ্ন না আসে। চিন্তা, শুধু গভীর চিন্তা অনবরত, বাধাহীন চিন্তাতে, শান্তমনে গভীর সত্যের উদয় হতে পারে……interrupted হলে সারাজীবনেও তার নাগাল পাওয়া যাবে না, যা কিনা হয়তো এক বৎসরের নির্জ্জনবাসেই আসতে পারত.."By keeping it constantly before one's mind……By always thinking and thinking upon it, much is done under these conditions… …much might be sacrificed to obtain these conditions.

জনসেবার জন্যে sacrifice করবার যদি প্রয়োজন হয়, তবে এও এক জনসেবা, এর জন্যেও বিরাট স্বার্থ ত্যাগের প্রয়োজন আছে। এ সাময়িক হুজুগের জনসেবা নয়। ধীর, শান্ত সমাহিত ভাবে উত্তরকালীন অনাগত জনগণের সেবা।

॥ ৯ই অক্টোবর, ১৯২৫ ॥

মানুষের সামান্য সুখদুঃখ, আমবন কাঁটালবাগানের পাহাড় ছাড়ান বেয়ে দিব্যি চলছে। Annytaর মত কত মেয়ে কত দুঃখী··সন্ধ্যার আকাশে কত শত শত গ্রহ-নক্ষত্র—কত জগতের ছড়াছড়ি—বিরাট নাক্ষত্রিক শূন্য—ঠাণ্ডা জনহীন—পৃথিবীর ফুলফল গতাপ।ত··সামান্য সুখদুঃখ—গ্রহ-নক্ষত্র লাটিমের মত ক্রীড়া-কন্দুকের মত আকাশে ঘুরছে। এই আনন্দলীলায় সব প্রাণীই যোগ দিচ্ছে। সুখদুঃখ জন্মমৃত্যু সবই খেলা, দুদিনের। কিছুতেই ব্যথিত হবার কিছুই কারণ নেই। নদী বেয়ে যে শব ভেসে যাচ্ছে, কে জানে হয়ত দূর কোন অজানা নক্ষত্রে ওর মৃত্যু নবজীবন লাভ করেছে। ওর মৃত্যুযন্ত্রণা সার্থক হয়েছে! এই বিচিত্র বিশ্বলীলার সকলেই যে যাত্রী। ফুল, ফল, গাছ পাখী, মানুষ সকলেই।

কিন্তু ক'জনে জগতের বাইরের এই বিরাট শূন্যের দিকে চেয়ে পৃথিবীর জীবনের সুখদুঃখের উর্দ্ধের কথা ভাবে? Crowd mindএর বাইরে সকলেই নয়—সকলেই গড্ডলিকা। খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে নিশ্চিন্ত আছে। জগতের

বড় বড় মনীষাসম্পন্ন চিন্তাবীর কয়জন? উপনিষদের ঋষি পথে-ঘাটে সুলভদর্শন ন'ন। সকলেই শঙ্কর নন, প্লেটো নন, নিউটন ক্যারাডে গ্যালিলিও কোপার্নিকাস গাউস ইনষ্টিন নন। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ধূলিরাশির আবরণ ভেদ করে ক'জনের চোখ বাইরের অনন্ত ঊর্দ্ধ আকাশের ঘূর্ণ্যমান সদাচঞ্চল বিরাট বিশ্বজগতের দিকে যাবে?

দুই এক জনের—

তারা জনপ্রবাহের কেউ নয়, তার অনেক ঊর্দ্ধে।

॥ ১৭ই নভেম্বর, ১৯২৫ ॥

সন্ধ্যার সময় টেবিলে আলো জ্বলছে। লেখার পাতাগুলো ছড়ানো আছে। ফুলদানিটাতে Chrysenthymam, কলাফুল। এই সন্ধ্যা, এই লেখবার টেবিল অত্যন্ত রহস্যময়, অর্থযুক্ত- হয়ত একশ বৎসর পরে আমার কোনও চিহ্নও পৃথিবীতে খুঁজে মিলবে না, কিন্তু আমার এই লেখা* হয়ত থেকে যাবে। হয়ত ক'লোকের মনে আশা, সান্ত্বনা দেবে। হয়ত পাঁচশত বছর পরে—যদি আমার লেখা বেঁচে থাকে তবে—আমি—এই আমি—এই অত্যন্ত জীবন্ত প্রত্যক্ষ আমি, অনেক প্রাচীনকালের এক লেখক হয়ে যাবো। আমার বই-পত্তর বড় বিশেষ কেউ ছোঁবে না। তখনকার দিনের নতুন নতুন উদীয়মান লেখকদের বই সব খুব চলবে। অনাগত ভবিষ্যতের সে-সব বংশধরগণের জন্যে আমি আলো জেলে তেল খরচ করে, আমার যথাসাধ্য বুদ্ধির অর্ঘ্য, যতই সামান্য হোক, যতই অকিঞ্চিৎকর হোক তবুও দেবো, দিতেই হবে। মনের মধ্যে সে প্রেরণা যেন অনুভব করছি। তারপরে তা বাঁচুক আর না বাঁচুক। আমি আর দেখতে আসবো না। আমার ফুলদানীর এই অত্যন্ত বড় বড় ও সুন্দর chrysenthemam ফুলটা আর বছর এ সময় কোথায় থাকবে? আশি বছর পরে আমি কোথায় থাকবো?

এই তো যুগ-যুগের শিক্ষকতা। যুগযুগের জনসেবা সে। এক জন্মের suffering সেখানে সার্থক। উত্তরকালের শত শত অনাগত তরুণ মনে যখনই দুঃখ আসবে, তাদের কচি প্রাণে আশা, বল, আনন্দ দেওয়া, জীবনের পথ দেখিয়ে দেওয়া—এক জন্মের জন্য জীবন নয়, দু'দশ বৎসরের সাময়িক উত্তেজনা

* 'পথের পাঁচালী' লেখা হচ্ছিল।

নয়, যুগযুগের জনসেবা। সে দিকে মনে রেখে কাজ করতে হবে। সাময়িক হাততালির দিকে নয়। কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় চৈতন্য-চরিতামৃতে কি করেছেন? বুদ্ধদেব কি করেছেন? স্বয়ং চৈতন্য কি করেছেন? তাঁদের এক জন্মের suffering, ব্যাকুলতা, ধ্যান সব ধন্য হয়েছে—কারণ যুগেযুগে তাঁদের কাহিনী পড়ে লক্ষ লক্ষ কুয়াশাচ্ছন্ন মন আলোর সন্ধান পাচ্ছে। suffering এদিক থেকে মস্ত জিনিষ, কেউ যেন সে কথা না ভোলে। জীবনে যদি বড় দুঃখ পাও, দুঃখ লিখে রেখে যেও উত্তরকালের জন্য। sincere দুঃখের কাহিনী চিরদিন অমর থাকবে, কিন্তু তা চিরদিন লোকের মনে বল দেবে। পূর্ণ-অন্ধকার অমাবস্যার পরই শুক্লপক্ষের চাঁদ ওঠে—দুঃখের রাত্রিতেই তারা খুব উজ্জ্বল হয়।

॥ ২০শে নভেম্বর, ১৯২৫ ॥

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা। এই মাত্র ফিরে থেকে আসছি। আজ ইসমাইলপুর থেকে ভাগলপুর আসবার সময়ে শূয়রমারীর খেয়া-ঘাটে এপারে যে নৌকা লেগেছিল, যাতে ছেঁড়াখোঁড়া হলদে রংএর বই খুলে মাঝিরা পড়ছিল—জনসেবকদের কথা মনে এলে যেন এর কথা মনে আসে—নৌকাতে যে মেয়েটি ময়লা কাপড় পরে বসেছিল ও নদীতে নেমে কাপড় হাঁটু পর্য্যন্ত তুলে চলে গেল, ওর কথাও যেন মনে থাকে। স্বরাঠা বেঁধে ওরা নাকি কোন্ কুটুমবাড়ী নেমন্তন্ন খেতে গেল। আর ওই যে ছেলেটা বললে তার বাড়ী বজাদপুর, ওর কথাও—সাবোর ষ্টেশনের বাইরে লতাকাটা পাতা কুড়িয়ে আগুন পোয়ালো, গাড়ীতে ওই লোকটাকে বিড়ি খেতে বারণ করা—এই সময়ে আলো জ্বালিয়ে বড় বাসার টেবিলটার এই সব লেখা অনেককাল মনে থাকবে। শূওরমারীতে আজ ঘি খুঁজলেই পাওয়া যেত—মুকুন্দি বলেছিল—কার্ত্তিক খুঁজলে না ভাল করে। এখানে মোটেই শীত নেই। ইসমাইলপুর কাছারীতে কদিন কি শীতই পেয়েছি। আগুন রোজ সন্ধ্যায় না পোয়ালে রাত কাটতো না। রামচরিত রোজ খড়ের বোঝা নিয়ে এসে আগুন করতো। সেদিনকার শিকারটা খুব জোর হয়েছিল। বন্দুক নিয়ে কাদায় কাদায় বেড়ানো—প্রথম কুণ্ডীটাতে এত হাঁস ছিল একটাও মারতে পারা গেল না। শুধু এদিক ওদিক দৌড়ে দৌড়ে হয়রান—

॥ ৯ই ডিসেম্বর, ১৯২৫, ভাগলপুর ॥

লেখাপড়া একটা খুব বড় মানসিক দুঃসাহসিকতা। যারা সারাদিন ঘরে বসে বসে পড়ে, তাদের শরীর ঘরটার চারধারের দেওয়ালে বদ্ধ থাকলেও মন উড়ে যায় অনেক অনেক দূরে—অসীম শূন্য পার হয়ে কোটি কোটি অজ্ঞাত নক্ষত্রলোকের দেশে দেশে। সময়ের কুয়াশা ভেদ করে তাদের মন ফিরে যায় একেবারে পৃথিবীর সে-যুগে যখন মানুষসৃষ্টি আরম্ভ হয় নি, জলাজঙ্গলে অজ্ঞাত ভীষণ-দর্শন অধুনালুপ্ত অতিকায় প্রাণীদের সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞাত গাছপালায় ভরা আদিম যুগের জঙ্গলে। এই জগতে সব চেয়ে বড় আনন্দ হচ্ছে অজানার আনন্দ—জানা জিনিষে কোনো সুখ নাই।

এই নতুন জিনিষের আনন্দ, অজানার আনন্দে বিশ্বজগৎ ভরা। মানুষের সঙ্কীর্ণ ইন্দ্রিয়শক্তির চারপাশ ঘিরে, তার চোখের সামনে, তার কানের সামনে তার অনুভব ও স্পর্শশক্তির সামনে, তার মনের সামনে অনন্ত অসীম রহস্যময় অজানার মহাসাগর। তার দূর দিকচক্রবালের ওপারে ঘন ঘন আবছায়া কুয়াশায় অস্পষ্ট কল্লোলও শোনা যায় না—এত দূর সেদিক। এই অসীম অজানা সাগর মানুষকে অজানার আনন্দ দেবার জন্য যেন তার চারিধার ঘিরে আছে। কে আছে যার সাহস, বুদ্ধি, মন এত দৃঢ় যে অজানার দরিয়ায় পাড়ি জমাতে চলে? কূল আঁকড়ে তো সকলেই পড়ে রইল। দিক্-দিশাহারা অকূল-রহস্য মহাজলধিতে কে 'বাচ' খেলতে চলবে—কোথায় সে বীর ব্রাত্য, মুক্ত আত্মা?

সংসারের ধুলায় পড়ে সবাই লুটোপুটি খাচ্ছে—সুদের হিসাবে খাচ্ছে, গাঁজা খেয়ে আনন্দলাভের চেষ্টা করছে, সংসারের সবাই আনন্দকে খুঁজছে। কি আনন্দের জলধি যে সামনে অক্ষুণ্ণ রইল তার দিকে তো চাইবে না।

সে উচ্চ আনন্দের ভাণ্ডারকে ব্যবহার করবার মত শিক্ষা-দীক্ষা সকলের থাকে না, অধিকার সকলের থাকে না।

এইজন্যই মনে হয় সংসারে কাউকে ঘৃণা করতে হবে না। মানুষ এই উচ্চ ব্রাত্য, আনন্দের খবর না জানতে পেরেই অ-সুখে হিংসায় ধুলায় কাদায় পড়ে লুটোপুটি খায়। স্বার্থদ্বন্দ্বে নিজের সুখ খুঁজতে গিয়ে নিজেকে আরও হীন, অসুখী করে তোলে। তাদের দোষ নেই। হতভাগা তারা, সকলে আনন্দকেই খুঁজছে। কিন্তু শিক্ষাদীক্ষার অভাবে আনন্দের পথ না জেনে ভুল পথ ধরেছে। শুধু অবগুণ্ঠনময় বিশ্বজগতের অনন্ত রহস্য-লোকের অজানা জীবনানন্দের পথ দেখিয়ে দেবার কেউ নেই বলেই তার এমন হয়েছে। নইলে একবার চোখ ফুটলে তারা সকলেই ঠিক পথই ধরত, কারণ নিজের ভাল পাগলেও বোঝে।

কেউ নেই—কেউ নেই—তাদের মুখের দিকে চাইবার কেউ নেই। কোন্ মুক্তপুরুষ অনন্ত অধিকারের বার্ত্তা নব-আনন্দের তড়িৎলেখায় তাদের উপেক্ষিত অন্ধ বুভুক্ষাশীর্ণ প্রাণে পৌঁছে দেবে ?

॥ ১২ই ডিসেম্বর, ১৯২৫ ॥

হঠাৎ জানালার ধারে এসে দাঁড়ালাম—বাইরে শীত কমে গেছে—জ্যোৎস্নাসিক্ত লম্বা লম্বা ছায়া পড়েছে—আলো-আঁধারে গাছগুলোর লম্বা লম্বা ছায়া—মনে হোল এই যে সুন্দর পৃথিবী, এই জ্যোৎস্না ছায়া, ঐ রহস্যময় চিন্তা পাঁচশো বছর পরে কোথায় থাকবে ?

ঐ দূরে যে কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করছে, এই বাঁশঝাড়ের বাঁশগুলো—আজ যারা সব জীবন্ত স্পষ্ট মূর্ত্তিমান—আজ আমার জীবনের যে দুঃখ সুখ আমার কাছে স্পষ্ট জীবন্ত, তারা সব কোথায় থাকবে ? কোথায় মিশে যাবে—কোন্ দূর অতীতে ? আবার তাদের জায়গায় নূতন সুখ, নূতন অনুভূতি—এতদিনের অচঞ্চল, গতিহীন জড় সংসার যেন হঠাৎ তার চোখে সচল গতির বেগে জলন্ত হয়ে উঠল, যা এতদিন ছিল বদ্ধ, হয়ে উঠলো রহস্যময় জীবন্ত গতিশীল—পথিক বিশ্ব এই অনন্তের মধ্য দিয়েও ঠিক আছে, তার বুকে যুগে যুগে কত বিনষ্ট অবোধ জীবের ব্যথা, কত অতীতের কত বেদনা-ভরা বুক তার, যুগযুগের বিরহ জন্মমৃত্যুর মধ্যে দিয়ে, প্রচণ্ড বিদ্যুৎ, সৃষ্টির কত ফুল, কত রহস্য নিয়ে যে চলে আসছে। হয়ত অনেক দিন পরে সৃষ্টি যখন সুন্দর হবে আগের চেয়েও তখন দূর স্বর্গের কোন্ কোণে মস্ত বড় জ্যোতিবাতায়ন খুলে দেখে অতীতদিনের জীবের কাহিনী তার মনে পড়ে যায়—অনন্তের পাষাণ আনন্দ বেয়ে যারা কত কতদিন মিশিয়ে গেছে—বুক হয়ত তার অনন্তের ব্যথায় ভরে ওঠে।

॥ ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯২৫, ভাগলপুর ॥

অসীম অনন্ত রহস্যভরা আকাশ—শুদ্ধ রাত্রি। পৃথিবী সুপ্তির অন্ধকার-ভরা। এখানে ওখানে দুএকটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে মাত্র। মাঝে মাঝে বাতাস লেগে নিমগাছের ডালপালার মধ্যে শির্ শির্ শব্দ হচ্ছে। আকাশ অন্ধকার, পৃথিবী অন্ধকার। আকাশে বাতাসে একটা নীরবতা। অন্ধকার অকাশে

নিমপাতার ফাঁক দিয়ে একটা তারা যেন অসীম রহস্যের বুকের স্পন্দনের মত টিপ টিপ করছে। তারাটা ক্রমে নেমে যাচ্ছে—আগে যেখানে ছিল ক্রমে তা থেকে নীচে নামছে। এই অনন্ত, সনাতন জগৎটা যে কি ভয়ানক, রুদ্র বেলা, প্রচ্ছন্ন করে রেখে দিয়েছে তা ঐ সঞ্চারমান তারাটিকে দেখলে বোঝা যায়। অন্ধকারের পেছনে একটা অসীম অনন্ত সৌন্দর্যলোক যেন আবছায়া আবছায়া চোখে পড়ে। ঐ তারার হয়ত একটা স্বাতী নক্ষত্র আছে। তা পার্থিব চোখের বাইরে—হয়ত তাতেও একটা আমাদের মত উন্নত ধরনের জীব থাকত। কি হয়ত আমাদের চেয়েও উন্নততর বিবর্ত্তনের প্রাণীর বাস। কি তাদের সভ্যতা, কি তাদের ইতিহাস, কি তাদের প্রেম স্নেহ, জ্যোৎস্না সৌন্দর্য্য—জানতে ইচ্ছে যায়। এই রহস্যভরা বিশ্বের বুকের স্পন্দনটা কান পেতে শুনতে ইচ্ছে হয়—আরও কত নক্ষত্র, কত জগৎ, কত প্রেম, কত মহিমা, কত সৌন্দর্য্য, অবাক্, বিশাল, বিপুল, অসীম চারধারে ছড়ানো। তা লোক-কোলাহলে শোনা যায় না। এই রকম গভীর রাত্রিতে, এই রকম নির্জ্জন জানালার ধারে বসে একমনে আঁধারভরা আকাশের স্পন্দমান নক্ষত্ররাজির দিকে চেয়ে থাকলে গভীর রাতের দক্ষিণ বাতাস যখন কালো গাছপালার মধ্যে শির্ শির্ বয়ে যায় তখন যেন মাঝে মাঝে অস্পষ্ট তার বুকের স্পন্দন শুনতে পাওয়া যায়।

আনন্দের রহস্যের গভীরতায়, বিপুলতায় মন ভরে ওঠে। জীবনের অর্থ হয়। পৃথিবীর জীবনের পারে যে জীবন, অসীম রহস্যময় অনন্তের পথে মহিমায় পত্রযাত্রার পথিক যে জীবন, তার সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়। দৈনিক জীবনের সংসারিক কর্ম্মকোলাহলে যে মহিমাময় শাশ্বত জীবনের সন্ধান আমরা পাইনা, জগতের সুখ দুঃখের ওপারে যে অনন্ত জীবন সকলেরই জন্যে চঞ্চল প্রতীক্ষায় রয়েছে, অসীম নীল শূন্য বেয়ে যার উদ্দাম রহস্যভরা পথযাত্রা, সে জীবন একটু একটু চোখে পড়ে।

"ভয় নেই, ব্যাঙ্কে টাকা জমিও না, অসময়ে দেখবার ভয়ে ব্যাকুলও হয়ো না। আমি অনন্ত জীবন তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করছি। কোনো ভয় নেই, পৃথিবীর কোন শান্ত, গ্রাম্য নদীর কূলের চিতায় তোমার হুঁসিয়ার জীবন যখন শেষ হয়ে যাবে সেদিন থেকে এ অসীম শূন্য অনন্ত রহস্য তোমার সম্পত্তি হয়ে দাঁড়াবে। আপনা আপনিই হবে, কোন ব্যাঙ্কে জমাবার কোনো প্রয়োজন নেই। জ্যোৎস্না ভালবাস? ফুল, ফল, পাখী ভালবাস? গান ভালবাস?

পৃথিবীর ভাগ্যহত ছেলেমেয়েদের করুণ দুঃখের কাহিনী শুনে চোখে জল আসে? মন আকুল হয়ে ওঠে? আর্ত্তের কান্না শুনে অন্যমনস্ক হয়ে যাও? তবে তুমি অনন্ত জীবনের উত্তরাধিকারী। তোমার সুখের সীমা হবে না। সে খুসি আনন্দের মধ্যে দিয়ে নয়, দুখের মধ্যে দিয়ে। নক্ষত্রে নক্ষত্রে দেখে বেড়িও, কত দীন দরিদ্র, আতুর জীব কঠিন সংগ্রামে পিষ্ট হয়ে যাচ্ছে,। নির্জ্জন নদীর তীরে কেউ হয়ত বসে বসে কাঁদছে—ওদের চোখের জল মুছে দেবার চেষ্টা কো'র, তাদের সঙ্গে কেঁদো, সেই তোমার স্বর্গ হবে। চোখের জলেই এ বিশ্বসৃষ্টি ধন্য হয়েছে। চোখের জল, কান্না, অত্যাচার না থাকলে বিশ্বের সৌন্দর্য্য থাকতো না। সব সুখ, সব পরিপূর্ণতা, সব ঐশ্বর্য্য, সব সন্তোষ, শান্তি, কেমন মরুভূমির মত ভয়ানক খাঁ খাঁ করতো—মাঝে—মাঝে আর্ত্তদের চোখের জলের শ্যামশান্তিভরা ওয়েসিস আছে বলেই তা করুণ মধুর হয়েছে।

জ্যোৎস্না যখন ওঠে, তখন অনেকদিন আগে মরে-যাওয়া ছেলের কথা ভেবো—দেখবে, জ্যোৎস্না মধুর করুণ হয়ে এসেছে। পাখীর গানে করুণ গৌরীর উদাস মীড় ধ্বনিত হচ্ছে। যে বুড়ীটা গ্রামের পাঁচজনের ঝাঁটা লাথি খেয়ে কিছুদিন আগে ঘরে ছেঁড়া কাঁথার মধ্যে জল অভাবে মৃত্যুতৃষ্ণা নিবারণ করতে না পেরে মরেছিল তার কথা ভেবো—মন উদার শোক ও শান্তিতে ভরে আসবে—জগতের পবিত্র কারুণ্যের, আশাহত ব্যর্থতার মধ্যে দিয়ে অন্তরের অনাহত ধ্বনি কাণে বাজবে। যে পরের ব্যথায় কাঁদতে শেখেনি জগতে সে অতি দুর্ভাগ্য। এক অতি অদ্ভুত জীবনরস থেকে সে বঞ্চিত হয়ে আছে।

কুকুরের ঘেউ ঘেউ যেন একটু থেমেছে। অন্ধকার যেন আরও একটু গভীর হয়েছে। তারাটা আরও নেমে গিয়ে গাছের ডালের আড়ালে পড়েছে—কি রুদ্র প্রচণ্ড তাণ্ডব গতি কি শান্ত নিরীহতার আড়ালেই প্রচ্ছন্ন রয়েছে।

ঝির ঝির বাতাসে নিমফুলের গন্ধ আসছে—বাতাবী লেবুফুলের গন্ধ আসছে।

তখনও আবার ফাল্গুন চৈত্র মাসে পাড়াগাঁয়ের বনে বনে ঘেঁটু ফুল ফুটে, বৈঁচগাছের নতুন কচি পাতা গজায়, দক্ষিণ বাতাস বয়, পাতার ফাঁকে ফাঁকে দোয়েল কোকিল ডাকে। কিন্তু তারা আর নেই—সময়ের পাষাণবর্ত্ম বেয়ে তারা কোথায় কতদূর চলে গিয়ে কোন দূর অতীতে মিশে গিয়েছে।

॥ ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯২৬, ভাগলপুর ॥

ভাবতে ভাবতে মনে হোল সাত বৎসর আগে এই দিনটিতে আমি প্রথম চাকরী নিয়েছিলাম। সেই মাইনর স্কুলের খাট, সেই লেপে শোওয়া—অন্ধকার আকাশে চেয়ে দেখলাম। যদিও আমি ভাগলপুর আছি, এখনি এত বড় একটা মিটিং করেএলুম, কাল সকালে হেমেন আসছে, ইসমাইলপুরে নায়েবের চার্জ্জ বুঝে নিতে যাবে, কিন্তু এই সবের মধ্যে পুরোনো দিনের ছবিগুলো বড মনে পড়লো, অনেক দূরে এক গ্রাম্য নদীতীরে কেমন চাঁপা কাঁটার বন, ধল চিতের খাল, নোনা কাদা, গোল, বেগোল, তারপর সেই পুকুরের ধার, সেই জানালা, সেই বর্ষার দিনে দরমাহাটার মোড়ে পাথরে চূণ ফেলা, সেই পানচালায় শোয়া, সেই কালী ডাকছে, ওঃ বড্ড কম!

জীবন কি করে অগ্রসর হচ্ছে? সাত বছরের এই পরিবর্ত্তন, পাঁচ হাজার বছর পরে কি হবে? এই বিভূতি, এই নায়েব, এই অম্বিকাবাবু, এই হেমেন, এই আমি কোথায় থাকবো? পাঁচ হাজার বছর আগে যারা ইজিপ্টে থাকতো তারাও হয়ত ঠিক এই রকম ব্যক্তিগত আশা নিয়ে যতীনবাবুর মত অহঙ্কার করত, বিভূতির মত ফোর্থ ক্লাসে পড়বার স্বপ্ন দেখতো—কিন্তু তাদের আশা অহঙ্কার প্রেম স্নেহ স্বার্থ নিয়ে কোথায় তারা আজ? দু-একটা ভাঙা ছেঁড়া মমী ছাড়া সেই বিশাল সভ্যতার অতীত জনসঙ্ঘের কি চিহ্ন পাওয়া যায়?

ঐ রকম আমাদেরও হবে। আমরাও আমাদের দ্বন্দ, মারামারি, অহঙ্কার, আশা, দাম্ভিকতা, ভালবাসা, স্নেহ, দয়া নিয়ে বুদ্বুদের মত মহাকাল-সাগরে কোথায় মিলিয়ে যাবো। আমাদের জায়গায় আবার নতুন একদল আসবে। তাদের ঠিক এই রকমই সব হবে। তারাও বলবে—আমরা বড, আমরা জমি কিনবো, বিষয় কিনবো, সুদে টাকা ধার দিয়ে বড় মানুষ হবো, বই লিখে নাম করবো—তারা বুঝতে পারছে না, তাদেরই পায়ের মাটীর তলায় এক নয় কত লক্ষ লক্ষ generation তাদেরই মত ভেবে কেঁদে হেসে আশা করে অহঙ্কার করে সুখী অসুখী হয়ে বগল বাজিয়ে নেচে কুঁদে হামবড়াই করে বর্ত্তমানে ধুলোমাটী হয়ে পৃথিবীর মায়ের বুকেই কেঁচোর মাটীর মত মিলিয়ে রয়েছে!

এখানে ওখানে, অন্ধকার আকাশে, বহিশূর্ন্যে—বিশ্বসৃষ্টির উপকরণ পাথর, ধাতুর পিণ্ডগুলো মাঝে মাঝে পৃথিবীর আকর্ষণে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের সংস্পর্শে এসে জ্বলে উঠে রয়েছে—ঐ একটা—আবার একটা—আবার ঐ—শূন্যটা একবার ধাতুর পাথরের উপকরণে ভরা—

ঐ বিশ্বজগৎ, সংসারের কোলাহল, ঊর্দ্ধের বড় জগৎটা ঐ অন্ধকার শূন্যে আত্মপ্রকাশ করছে।

ঐ যে গতি, ও বিশ্বের গতির প্রতীক। শুধু প্রতীক নয় ও তারই গতি। স্বয়ং সঞ্চরমান, ভ্রাম্যমাণ, ঘূর্ণমান বিশ্ববস্তুর অংশ। আপনা আপনি নিয়মে চলেছে। ওর দিকে চাইলে নিউটনের, কেপলারের, হেল্‌ম্‌ হেল্‌ট্‌জের, শঙ্করের, বরাহমিহিরের জগৎ মনে পড়ে—সে জগৎ ডাক্তার শরৎ সরকারের জগৎ নয়, গভর্ণমেণ্ট প্লিডার অমুকের জগৎ নয়, অমুক বড় মানুষ পেটো মহাজনের জগৎ নয়, অমুক ষ্টেটের অমুক ম্যানেজারের জগৎ নয়। কত পৃথিবীর, বিশ্বের ভাঙ্গা টুকরো ও! কত ইতিহাস ছিল তাতে! কত জীব কত সভ্যতা কত উত্থানপতন কি বিরাট রহস্য ওর আড়ালে প্রচ্ছন্ন রয়েছে! কি অনন্ত ধ্যানের চিন্তার সৌন্দর্য্যস্বপ্নের ধারণার জ্ঞানের বিষয় ওই পাথরের ধাতুর টুকরোগুলো তা কে ভেবে ভাখে?

আবার আকাশে চাও, Serius-এর পাশের, কত গ্রহনক্ষত্রের পাশের অদৃশ্য জগৎগুলোর কথা ভাবো! অন্ধকারে গা লুকিয়ে কোথায় ওরা অনন্ত পথে ঘুরছে? কি জীববাস তাতে? তাতে এরকম কত জীবের উত্থান পতন? কত দিনের ইতিহাস?

তবে এই পরিবর্ত্তনের মধ্যে, এই তাসের ঘরের মধ্যে, এই মেঘের প্রাসাদদুর্গের মধ্যে, আসল জিনিষটি কি? জনসেবা—এ জীবনের নয়। যুগযুগের জনসেবা। বিশ্বকে উপলব্ধি ক'রে, সত্যকে উপলব্ধি ক'রে, শাশ্বত সৌন্দর্যকে উপলব্ধি ক'রে, ধ্যানে, কল্পনায়, ছবিতে তাকে এঁকে যাওয়া। নয়ত এমন কাঁদিয়ে যাওয়া যে মানুষ চিরকাল কাঁদবে, এমন হাসিয়ে যে মানুষ চিরকাল হাসবে, এমন ভাবিয়ে যাওয়া যে মানুষ চিরকাল ভাববে, এমন দেখিয়ে যাওয়া যে তারা চিরদিন দেখবে।

শিক্ষকতা নয়, জনসেবা—দীন নিরহঙ্কার অথচ দৃঢ় পবিত্র হয়ে অবহিত মনে এই অতি মহৎ সার্থক সেবা।

বৎসরে বৎসরে এরকম বসন্ত কত আসে—কত নতুন মুখের আশা, কত নতুন স্নেহ প্রেম—মাথার উপরে নিঃসীম নীল শূন্য অনন্তের প্রতীক—এই নীল আকাশের তলে বৎসরে বৎসরে এরকম কচি পাতা ওঠা গাছপালা, বনফুলের ঝোপের নীচে বৈঁচি ষাঁড়া বাঁশনের আড়ালে যে শান্ত জীবনগতি বহুদিন ধরে ছাতিমবনের আমবনের ছায়ায় ছায়ায় বেয়ে

চলেছে, তারই কথা লিখতে হবে। ওদের হাসিখুসি ছোটখাটো সুখদুঃখ, আশা ভরসার যে কাহিনী, ওই দিয়ে দিতে হবে—তাদের জীবনের যে দিক আশাহত ব্যর্থতায় দীনতায় চোখের জলে অপমানে উদাসকরুণ, চাঁদের আলো যাদের চোখের জলে চিক্ চিক্ করে, ফাল্গুন-দুপুরের অলস গরম দমকা হাওয়ায় যাদের দীর্ঘশ্বাস ভেসে বেড়ায়, নিস্তব্ধ শান্ত সন্ধ্যা যাদের মনের মত ঝিলিঝিলি অন্ধকার ভরা নির্জ্জন—তাকেই আঁকতে হবে – মানুষের এই suffering এতো বড়।

বেড়াতে বেড়াতে চারধারের কাশজঙ্গলের গন্ধ ভেসে আসছে। চড়ুইপাখী কিচ্ কিচ্ করছে। সন্ধ্যার শান্তি ও অন্ধকার—অনেকদূরে এই ফাল্গুন মাসে দখিন হাওয়া বইছে। বনে বনে বাতাবী লেবুর গন্ধ ভেসে আসছে। এখন শান্ত সন্ধ্যার মিষ্টি বাতাবী লেবুফুলের গন্ধ পুকুরের ঘাটের পথে বইছে। রাঙা কাঞ্চনফুলের ছায়া পুকুরের জলের ওপর পড়েছে। ভিজে কাপড়ে বধূরা ঘাট থেকে বাড়ী যাচ্ছে। আর এখানে? এখানে চারদিক কাশের গন্ধে ভরপুর। মহিষের ধুরুইরা চীৎকার করছে। হু হু পশ্চিম বাতাসে বালি উড়ে চারধার অন্ধকার করে দিয়েছে। ঝাউয়া থুবড়ী, রামজোত, লোধাই এই বসন্ত, এই লেবুফুল, সৃষ্টির আনন্দ—এই সব তুচ্ছ জিনিসে জীবনের মাদকতাময় আনন্দ nudging of life যুগে যুগে, বিবর্ত্তনে এরকম আসবে—এই আনন্দ, এই উৎসব, যুগযুগের মাঝখান দিয়ে অনন্ত কাল ধরে চলছে—তারই মধ্যে জন্মেছি আমি--এরকম কত যাবো, কত আসবো--কত চরকে কলেজ স্কোয়ারে বেড়াবো, কত সরস্বতী পূজায় গান শোনা, কত "ফাগুন লেগেছে বনে বনে" কত Abyssinian horseman, কত চাপা পুকুর, কত অন্ধকারময়ী রাত্রি, কত বর্ষাসন্ধ্যায় কত অজানা বঁধুর গল্প মিলন কত জনের সঙ্গে বাহুতে বাহুতে বাঁধা কত উৎসবের দিন—কত সুকুমার, কত হুগলী ব্রিজ, কত কেওটায় সিঞ্চেতার গন্ধ, কত গুডফ্রাইডের ছুটিতে ছায়াভরা বৈকালে বোর্ডিং থেকে বাড়ী যাওয়া, কত ফাগুন দিনে প্রতিভা সুন্দরীর পড়া, কত জানালায় জানালায় ধূপ-গন্ধ—কত জন্মের মধ্য দিয়ে বারে বারে জন্ম থেকে জন্মান্তরে নূতন নূতন অজানা মায়েদের কোলে শিশু হয়ে হয়ে আসা যাওয়া, নব নব জীবনের অনন্ত উচ্ছ্বাস-আনন্দ।

হে আনন্দময়, যুগে যুগে তোমার মহারহস্যময় জীবনধারা বিজয়বৎ বিমৃত্যু,

বিশোক, পথহীন, মহাপথ ছেয়ে কত কল্প, মন্বন্তর, মহাযুগের মধ্য দিয়ে, শত সহস্র জন্ম মৃত্যুর মাঝ দিয়ে কোথায় যে ভেসে চলেছে।

নিয়ে চল, নিয়ে চল, নিয়ে চল,

মহাকালেরা মহাকলরবের মধ্য দিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে চল—

অনন্ত নীল ব্যোম-সমুদ্রে এখানে ওখানে পাটকিলরংয়ের মেঘদ্বীপের দিকে—

॥ ৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২৬, ভাগলপুর ॥

Life ! Life !

কাল রাত্রে অন্তরের মধ্যে জীবনের বিশাল তরঙ্গোদ্দাম অনুভব করলাম—ওরকম অনেকদিন হয়নি। শক্তির উৎসাহের, কল্পনার, আনন্দের, উদ্দীপনার, সৌন্দর্য্যের, মাধুর্য্যের কি বিরাট প্রাণ মণ মাতানো, পাগল করা, উদ্দাম, বাধাবন্ধহীন গতি-বেগ! নদীর কূলছাপিয়ে নিয়ে যাওয়া, ক্ষেপা-জোয়ারের কি দুর্মদ, ফেনিল, প্রণয়লীলা! মনের মধ্যে জীবন যেন বলছে—এই যে গণ্ডী তুমি তোমার চারিদিকে রচনা করে বসে আছো এরা তোমারই ভৃত্য, তোমারই দাস। তুমি কেন ভুল করে এদের হাতে ইচ্ছে করে খাঁচার পাখীর মত বন্দী হয়ে আছো? তুমি এদের চেয়ে অনেক বড়। জীবনটা ভালো করে দেখতে হবে। উপভোগ করতে হবে। জীবন-উৎসের মুল শুকিয়ে দেয় অলস নিষ্কর্মা জীবনযাত্রায়। শত্রুকে তাড়াতে হবে।

কূল ছাপিয়ে বেরিয়ে চলো! উদ্দাম উন্মত্ত বিজয় বিমৃত্যু গতির বেগে বার হয়ে পড়ো। কি ঘরের কোণে বসে মোকদ্দমার ফাইল আর ষ্টেটমেণ্ট ঘাটছে!—তোমার মাথার ওপর অনন্ত নাক্ষত্রিক জগৎ উদাস রহস্যময় অজ্ঞাত, নব নব ঘূর্ণ্যমান গ্রহরাজিকে বুকে নিয়ে চলেছে। ধূমকেতু নীহারকণা নীহারিকা সুদূর লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী আলোকবর্ষ পরের দেশ, নতুন অজানা বিশ্বরাজি, নতুন অজানা প্রাণীজগৎ, বিশাল প্রজ্বলন্ত হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, ক্যালসিয়াম্, ম্যাগনেসিয়াম্, লোহা, নিকেল, কোবাল্ট, এলুমিনিয়াম্-প্রচণ্ড জাগতিক তেজ X-ray, বিদ্যুৎ, চৌম্বকশক্তি, ইলেকট্রোম্যাগনেটীক ঢেউ, অনন্ত শূন্যপথে ভ্রমণশীল জ্বলন্তপুচ্ছ, জানা অজানা

ধূমকেতুরাজি, ঘূর্ণ্যমান ধাতুপিণ্ড, প্রস্তরপিণ্ডের অতি অদ্ভুত, রহস্যভরা ইতিহাস—এই জন্ম-মৃত্যু, পায়ের নীচের লক্ষকোটী প্রাণীর মরে যাওয়ার লীলাউৎসব। মৎস্যযুগ অঙ্গার যুগ, সরীসৃপযুগের প্রাণীদের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল কত ফুল ফল বন নদী পাহাড় ঝর্ণা কত কূলহীন, দিক্‌হীন গর্জ্জমান মহাসমুদ্র—অনাদি, অনন্ত, লীলাময়, রহস্যময়, অজ্ঞেয় জীবন মৃত্যুর প্রবাহ। এর মধ্যে তুমি জন্মেছ। আত্মাকে প্রসারিত করে দাও এদের মধ্যে! চুপ করে চোখ বুঁজে বসে এই গতিশীল তাণ্ডব-নৃত্য-চঞ্চল মহাকালের মহাপথযাত্রার উৎসবের কথা ভাবো—কোথায় যাবে তোমার দুদিনের বদ্ধজীবনের দৈন্য, কোথায় যাবে তোমার রুদ্ধ ঘরের অনির্ম্মল তুষ্ট হওয়ার ভাণ্ডার-- প্রাণের বেগে গতির বেগে ছুটে বেরিয়ে পড়ে দ্যাখো জীবন কি মহিমাময়, কি বিরাট, কি ঋদ্ধিশীল! কি অক্ষয় অনাদি অনির্ব্বাণ জীবন, সঙ্গীতের কি মধুর লয়-সঙ্গতি।

ধুড়ুর বাঁধা পায়রা হয়ে ছাদের আলসে আঁকড়ে পড়ে থেকো না, বাজ পাখীর মত ওড়ো—মাথার ওপরে যে অনন্ত অকূল শাশ্বত নীলাকাশ তার ঘননীলের মধ্যে পাখা ছেড়ে দাও, উড়ে যাও—উড়ে যাও—সুন্দর বৈকাল, আমের বউলের গন্ধ ভেসে আসছে, পাখী ডাকছে, বনঝোপের পাতা সর্ সর্ করছে—জীবনে এ বৈকাল কতবার আসে কতবার যায়, কিন্তু প্রত্যেক অপরাহ্ণই যেন নিত্য-নূতন মনে হয়, কারণ সামনে যে অজানা রাত্রি আসছে। অজানার আনন্দই মানুষের জীবনের সব চেয়ে বড় আনন্দ। অন্ধকারে সূর্য্য ডুবে গেল, কিন্তু আবার সকালে উঠবে। আবার নতুন জীবন নতুন ফুল ফল দূর্ব্বা শিশির পাখীর গানে আবার সঞ্জীবিত হয়ে উঠবে। আবার কত হাসি, কত কুমারীর ঘাটে যাওয়া, কত জানালায় ধূপগন্ধ—

অশান্ত প্রাণপাখী আর মানে না—সব দিকের বন্ধনহীন, নিঃসঙ্গ, উদাস, অনন্ত অকূল নীলব্যোমে মুক্তপক্ষে ওড়বার লোভে ছটফট করছে—জীর্ণ পিঞ্জরদলে শুধু অধীর আকুল পক্ষবিধূনন! উড়তে চায়—উড়তে চায়—পরিচিত, বহুবার দৃষ্ট, একঘেয়ে, গতানুগতিক গণ্ডীর মধ্যে আর নয়, একেবারে অপরিচয়ের অকূল জলধিতে পাড়ি দিতে চায়, হয়তো দূরে দূরে কত শ্যামসুন্দর অজানা দেশসীমা, তুহিন শীতল ব্যোমপথে দেবলোকের মেরুপর্ব্বত। আলোর পক্ষে ভর দিয়ে শুধু সেখানে যাওয়া যায়, অন্যভাবে নয় —সেখানেও ক্ষুদ্র গ্রাম্য নদী বয়ে যায়--দেববধূগণ পীত হরিৎ তারকার আলোকে মৃদুপদবিক্ষেপে জল-খেলা করতে নামে।

জীবনটাকে বড় করে উপভোগ করো; খাঁচার পাখীর মতো থেকোনা। জগতের চল-চঞ্চল গতি দেখে বেড়াও দেশে দেশে। দিল্লী আগ্রা গিয়ে ছাখো মোগল বাদশাহদের সিংহাসন। ঐশ্বর্য্য ছায়াবাজির মত কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে। পাহাড়ে ওঠো, কেদার-বদরীর পথে বেড়াও, অবসাদ দূর হবে, মন দৃঢ় হবে।

॥ ২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯২৬, ভাগলপুর ॥

দূরের দিগন্তপ্রসারী মাঠের শ্যামলতা, চারিধারের স্নিগ্ধ শান্তি পাখীর ডাক, প্রথম শরতের নীল আকাশ এ সবের দিকে চেয়ে মনে হোল— কত যুগ যুগের এমন ধারা স্পন্দন যেন এসে মনে পৌঁছবে—একটা কথা মনে ওঠে— মানুষের অমরত্ব ব্যষ্টি হিসাবে সত্য না সমষ্টি হিসাবে সত্য? হাজার বছর পরে মনুষ্য জাতি কিরকম উন্নততর ধরনের সভ্য হবে, সে প্রশ্ন আমার কাছে যতই কৌতূহলজনক হোক, আমি এই আমার অত্যন্ত পরিচিত আমিত্বটুকু নিয়ে হাজার বছর পরে কি রকম দাঁড়াবো—এ প্রশ্নটা আরও বেশী কৌতূহলপ্রদ। কে এর উত্তর দেবে?

আজকার এই পরিপূর্ণ শান্তির মধ্যে হঠাৎ মনে যেন ভাসা ভাসা রকমের এই কথা এল যে, মানুষের এই যে সৌন্দর্য্যানুভূতি, এই গভীর ভাবজীবন— ভগবান কি জানেন না এসব পূর্ণতা প্রাপ্ত হতে কত সময় নেয়? যিনি সুদীর্ঘ যুগ ধরে এই পৃথিবী করেছেন তিনি সময়ের এ উপযোগিতাটুকু নিশ্চয়ই জানেন। তা হোলেই কি এই দাঁড়ায় না যে মৃত্যুর পরেও ব্যষ্টি জীবন চলতে থাকবে—থেমে যাবেনা।

তাই তো মনে হয় সুদীর্ঘ ভবিষ্যৎ ধরে এই আলো পাখী ফুল আকাশ বাতাসের মধ্যে দিয়ে কত শত শৈশবের হাসি খেলার মধ্যে দিয়ে কত বার কত আসা যাওয়া।

আজ দুপুরের নরম রোদে বড় বাসায় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছেলে বেলাকার কত এরকম দুপুরের কথা মনে হোল—সেই সইমা, দিদিদের কুলতলা, সইমার বাড়ী রামায়ণ পড়া, সেই হাটবার—সব দিনগুলা একেবারে সেদিনের লুপ্ত স্মৃতি নিয়েই যেন আবার এল—

গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত বড় বাসার ছাদে বসে মেঘলা রাতে কত কথা মনে আসে—আবার যদি জন্মই হয় তবে যেন ঐরকম দীন হীনের পূর্ণ কুটিরে অভাব

অনটনের মধ্যে, পল্লীর স্বচ্ছতায় গ্রাম্য নদী গাছপালা নিবিড় মাটীর গন্ধ অপূর্ব্ব সন্ধ্যা মোহভরা দুপুরের মধ্যেই হয়—

যে জীবনের এ্যাডভেঞ্চার নেই, উত্থান পতন নেই—সে কি আবার জীবন? সেই পুতু পুতু ধরনের মেয়েলি একঘেয়ে জীবন থেকে ভগবান তুমি আমায় রক্ষা কোরো।

॥ ৯ই আগষ্ট, ১৯২৭ সাল ॥

সকালে হাওড়ায় চেপে কেমন বর্ষাস্নাত মেঘমেদুর ভূমিশ্রীর মধ্যে দিয়ে সারাদিন ট্রেনে করে এলাম! নিউ কর্ড লাইনের দুধারে কেমন সবুজ বর্ষাসতেজ গাছপালা ঝোপ-ঝাপ, ধানের মাঠ। বাড়ীতে বাড়ীতে রান্না চাপিয়েছে— ঘরে ঘরে যে সুখদুঃখের লীলাদ্বন্দ্ব চলছে, কেমন ঘরের পেছনে খড়ের ঘরের কানাচে ছোট ডোবায় পদ্মবনগুলি! বড় বড় পদ্ম পাতাগুলো উল্টে রয়েছে, সাদা সাদা পদ্ম ফু'টে—কেমন যেন সব ভাই বোন নীল আকাশের দিকে চেয়ে সারাদিন পদ্মের চাকা তুলে তুলে যায়—এই ছবি মনে আসে। মাঠের ধারের বনে দীর্ঘ ছাতিম গাছটা, নীচে আগাছার বনজঙ্গল। বীরভূমের মাঠে মাঠে ছোট ছোট চাষার চাল ঘর, লাউ কুমড়োর লতা উঠেছে রাঙামাটির দেওয়াল বেয়ে, মেয়ে ছেলেরা গাড়ী দেখছে—সেই যে ছোট ঘরখানা থেকে গাড়ীর শব্দ শুনে মা ও মেয়ে ছুটে (বয়স দেখে মনে হলো) বার হয়ে এলো, আমার এসব কথা আজীবন মনে থাকবে।

॥ ২রা আগষ্ট, ১৯২৭ সাল॥

বড় বাসার ছাদ ভাসিযে কি চমৎকার—যেন ঠিক শরতের রৌদ্র উঠেছে আজ। নীল আকাশের এমন চমৎকার স্বচ্ছ নীল রং অনেকদিন দেখিনি। কি সুন্দর সাদা সাদা পেঁজা তুলোর মত মেঘের রাশি হালকা গাড়ীতে উড়ে চলেছে। চেয়ে চেয়ে নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে কেবলই পুরোণো দিনের কথা মনে আসে—সেই আমাদের খড়ের ঘরখানা, অতীতের কত মধুমাখা দিনগুলোর কথা, সকালে ঝিল, বিলের ধারে এই বর্ষার মনসা ভাসান শুনতে যাওয়ার উৎসাহ, সেই পেয়ারা খেতে খেতে পূব-মুখো যাওয়া। মা বসে বসে সেলাই করতেন। নীরব দুপুরে বাইরের দাওয়ায় বসে পড়তাম—সেই সব দিনগুলো! সেই বন্ধুদের বাড়ী বিলাতী কার্ডের ছবি দেখে দেশকে প্রথম চিনেছিলাম, কিন্তু কি চমৎকার লাগে।

(আবার চব্বিশ বৎসর আগের একটা এমনি দিন থেকে জীবন আরম্ভ হয় না ? আমি অমনি লুফে নেবো।)

বহুদূরের নক্ষত্রে, গ্রহে গ্রহে কেমন সব জীবনধারা ? সময়ের মাপ-কাঠিটা তাদেরও কি আমাদের মত ওই রকম ছোট, না বড় ? সেখান থেকে এসে আবার পাকড়াটোলার পথটায় আসন্ন সন্ধ্যায় আবার ঘোড়া ছুটালাম ! কখনো মাঠ, কখনো ঝোপ-ঝাপ, কখনো উলুবন, কখনো শুধু আকাশ, কখনো ভুট্টাখেত—এই রকম থরে থরে নূতন পরিবর্ত্তনের মধ্যে দিয়ে এই উন্মুক্ত গতি বড় ভাল। সন্ধ্যার অন্ধকারে ঘোড়া ছুটলে অন্ধকারে ধূসর পাহাড়টাও যেন সঙ্গে সঙ্গে নাচতে লাগল—দূর আকাশে শুকতারা উঠেছে, কি জানি কোন দূরের জগৎ, সেখানে কি ধরনের জীবনযাত্রা !

॥ ৬ই আগষ্ট, ১৯২৭ সাল ॥

পূর্ব্বদিকের জানালাটা দিয়ে আজ বেশ ঝির ঝির করে হাওয়া বইছে—একটু মুখ তুলে জানালার ওপর গরাদের ফাঁক দিয়ে চেয়ে দেখলেই বটেশ্বর নাথ পাহাড়টা দেখা যায়। খাটের পাশে টাটকা তাজা বেল ফুলের ঝাড়টা টবে বসানো, একরাশ ফোটা-ফুল বিছানায় ! শুয়ে এমার্সন পড়তে পড়তে মনে হোল ১৯১৮ সালের এমনি রাত—সেও ১৪ই ভাদ্র। অশ্বিনীবাবুর বোর্ডিংএর একটা এঁদো ঘরের গুমট গরমে প্রথম সিট নিয়ে এই রাত্রিটা কাটিয়েছিলাম। কত আনন্দে, কত উৎসাহে—কি অপূর্ব্ব মোহ, সেদিনের রাত্রির ঘুমঘোরে আমাকে আচ্ছন্ন করেছিল—তারপর দিন সকালটিতে আমার সেই নতুন জামাটি গায়ে দিয়ে কত যত্নে কামিয়ে গাড়ী ধরতে ছুটেছিলাম। সে সব দিনের ইতিহাস আর কোথাও লেখা থাকবে না—নেইও। শুধু এক তরুণ মনে তা আঁকা আছে—আর পঞ্চাশ বছর পরে, কি আর পাঁচশো বছর পরে—সেসব দিনের অপূর্ব্ব পুলকের কাহিনী শতাব্দীর পূর্ব্বের প্রথম বসন্তের পুষ্পস্তবকের ন্যায় লুপ্ত হয়ে যাবে। তবু যেন মনে থাকে একদিন সে অমৃতধারা বাস্তব জগতেরই ছিল।

✓তাই যখন কোন মিউজিয়মে মমি দেখি তখন সেসব চূর্ণায়মান সাদা হাড়েটিড়ের বুকে, এই পৃথিবীর নীল আকাশ, রাগরক্ত সন্ধ্যা, বাতাস, আলো, কোনো সুশ্রী শিশুর মুখটি, তরুণীর চোখের দীপ্তি, কোন্ নিভৃত অপরাজয়ে অজানা ফুলের সুবাস—এই সব একদিন যে আনন্দের বাণ ছুটিয়েছিল—তিন হাজার বছর অতীতের যে লুপ্ত হাসিগান, মনের শান্তি,—বহুদিন লুপ্ত যেসব

জ্যোৎস্নারাত্রি, প্রাসাদশিখরে পাদচারণশীল সম্রাট থট মোমিনের চক্ষুকে মুগ্ধ করেছিল—মরুভূমির দূরপ্রান্তনীল সে সব সান্ধ্যসূর্য্যরক্তচ্ছটা, সে ঊর্দ্ধমুখ উষ্ট্রশ্রেণী, খর্জ্জুর কুঞ্জের শ্যামলতা আবার জীবন্ত হয়ে ওঠে। তখনও পৃথিবী এমনি সুন্দর ছিল, ঐ জানালার ছোট্ট ছায়াভরা ঝোপে খঞ্জন পাখী এমনিই নাচত—সে মাধবী রাত্রি, সে নাচ আজকালকার কালে কারুর জানা না থাকলেও একদিন তারা সত্য সত্যই বজায় ছিল।

এমনি আমরাও চলে যাবো। কত হাজার বছর পরে আমাদের হাড মাটীর তলা থেকে হয়তো প্রস্তরীভূত অবস্থায় বেরুবে। তখনকার সে হাজার বছর পরের ভবিষ্যৎ-বংশধরগণ যেন না ভাবে এগুলো বুঝি চিরকাল এইরকম দাঁত বারকরা শাদা হাড়ই ছিল—তারা যেন ভুলে না যান, এককালে সেগুলোও তাদের মতই এই বিশ্বের আলো জোৎস্নার সকাল সন্ধ্যার অংশীদার ছিল। তাদের বীণার যে সুরপুঞ্জ বেজে বেজে নীরব হয়ে গিয়েছে তাদের বুকে অদৃশ্য কাল-মুহূর্ত্তগুলিতে তাদের লিখন আছে। হে আমাদের স্নেহ-ভাজন উত্তরপুরুষগণ, সে কথা মনে রেখো।

কাল এমনি কেটে যায়, বৎসরে বৎসরে ঝোপেঝাপে ফুলদল এমনি ফোটে আবার ঝরে পড়ে, একদল পাখী গান শেষ ক'রে মরে হেজে যায়। তাদের ছানারা মানুষ হয়ে আবার গান ধরে—গান বন্ধ হয় না তাবলে, ফুলফোটা বন্ধ থাকে না তাবলে।

শুধু আমাদের পৃথিবীতে নয়, অনন্ত আকাশের অসীম গ্রহতারার মধ্যে হয়তো কত লুকানো অদৃশ্য জগৎ আছে। তাদের মধ্যের জীবেদের সম্বন্ধেও এই কথাই খাটে। উচ্চস্তর বিবর্ত্তনের প্রাণী হলেও জন্মমৃত্যু আছেই আছে। এতবড নাক্ষত্রিক বিশ্বের যখন আরম্ভ ও শেষ আছে তখন প্রাণীর কথা তুচ্ছ।

অনন্তকালের মুহূর্ত্তগুলি এই রকম শত শত দৃশ্য অদৃশ্য বিশ্বের শত শত প্রাণীর বুকের কথায় ভরা, কত হাসি ব্যথার গানে সুরময়।

অনন্ত দেবের বাঁশির তান অনন্ত যুগমুহূর্ত্ত ছেয়ে ভেসে আসছে—কান পেতে শুনলেই শোনা যাবে। শুধু আনন্দ দেওয়াই তার লক্ষ্য। এক পলকে জীবনকে চিনে নাও—দুঃখের পথ বেয়ে যেতে হবে বটে কিন্তু সামনে আনন্দধাম—দুঃখনদীর ওপারে।

উঃ! কি সত্যি কথাই বেরিয়েছে উপনিষদের ঋষির মুখ দিয়ে—

আনন্দেন খলু ইমানি সর্বাণি ভূতানি জীবন্তি...

কিন্তু এই সকল আবোল তাবোল ভাবনার মধ্যে এটুকু ভুলে গেলে চলবে না যে ১৯১৮ সালে এতক্ষণ অশ্বিনীবাবুর বোর্ডিংএ আলুভাতে ভাত খেয়ে মির্জাপুরের বেনের দোকানটা থেকে একপয়সার চা-খড়ি কিনে কাগজে মুড়ে পকেটে নিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে শেয়ালদায গাড়ী চেপেছি—হয়তো গাড়ী ছেড়েছেও।

তারপর সারাদিন আর একথা মনে ছিলনা—বিকেলের দিকে খুব ঘোড়া ছুটিয়ে বর্ষাস্নাত আকাশের তলে মাঠে মাঠে বেড়ালাম তখনও মনে হয় নি। এই এখন আবার রাত আটটার পর জানালার ধারে বসে লিখতে লিখতে টবের গাছটার ফুটন্ত বেলফুলেব গন্ধে সে কথা মনে পড়ল।

এখন সেই বাঁশবনে ঘেরা বাড়ীতে অন্ধকার রাত্রি, হয়তো টিপ্ টিপ্ বৃষ্টির মাঝে আনন্দের কাহিনী দেখব। কতকাল হ'য়ে গেছে। বাইরে অন্ধকার মাঠের দিকে চেয়ে ভাবলাম আজ যদি যাই? সেই জামাটা প'রে? অন্ধকার রাত্রে ভাঙ্গা দরজার ইটগুলো পেরিয়ে পোড়ো ভিটাতে বর্ষাসতেজ সেওড়া ভাঁটবন। বনচালতা গাছ—বড় চারাটা। বাঁশঝাড় নুইয়ে পড়েছে—ঘনবনে ঝিঁঝিঁ ডাকছে, পিছনের গভীর বাঁশবনে শিয়াল ডাকছে। নয় বছর আগেকার সে রাতটার আনন্দের ইতিহাস কোথায় লেখা থাকবে? ঐ পোড়ো ভিটার অন্ধকারে, ঘুপসি বাঁশগাছের শন্ শন্ শব্দে, গভীর রাত্রিতে গভীর বনের দিকে হুতুম পেঁচার ডাকে।

এ সব রাতে একমনে ভাবতে ভাবতে শুধু এই অসীম রহস্যভরা জীবন বড় চোখে পড়ে—এ কোথায় এসেছি? কোথায় চলেছি? সংসারের কল-কোলাহলে যা কখনো মনেও ওঠে না, এ সব নীরব অন্ধকার রাত্রিতে জানালার ধারে বসে গুনগুন করে কোনো গানের একটা লাইন গাইতে গাইতে একদণ্ডে সেটা বড় ধরা দেয়। তাই সকল জ্ঞানের পুঁথিতেই নির্জ্জনতার পরিপূর্ণ অবসর ভরা। নির্জ্জনতায় বড় প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। দূরের ঐ তারাটার দিকে চেয়ে চেয়ে মনে হয় এ রকম হাসি আশাভরা জীবনস্রোত হয় তো ওখানেও চলছে—কে জানে? বিশাল Globular Custerএর দেশ, বড় বড় Star Clouds, ছায়া-পথ, কি অজানা বিরাটত্ব, অসীমতা ভরা এ বিশ্বে জন্মেছি। শুধু Sagitorious অঞ্চলের নক্ষত্র-ঠাসা আকাশটার কথা মনে হলেই মন শিউরে উঠে—পুলকে, অনির্ব্বচনীয় বিস্ময়ে আত্মহারা হয়ে ওঠে।

তাই এই নির্জ্জন রাত্রিতে মনে হয় সুখ আছে এক জিনিষে। কি সে?

মনকে প্রসারিত ক'রে এই অনন্তের অসীমতার সঙ্গে এক ক'রে দেবার চেষ্টা করো। মনে ভাবো অনন্ত আকাশের এই ছোট্ট একরত্তি পৃথিবীটার মত শত শত লক্ষ লক্ষ অজানা জগৎ—তার মধ্যের অজানা প্রাণীদের সে সব কত অজানা অদৃষ্ট ধরনের জীবন-যাত্রা, কত সুখদুঃখ, কত আনন্দ। সে সব কি অজানা উচ্ছ্বাস—তোমার মন অসীমতার রহস্যে ভরে উঠবে। ক্ষুদ্রত্ব ভেসে যাবে অনন্তের অমৃতের জোয়ারে।

মনকে সে ভাবে যে তৈরী করেছে, জগৎ তার প্রিয় সাথী—চিরদিনের বন্ধু।

"জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য
চিত্ত ভাবনাহীন"

কিন্তু ক'জনে চিনতে চায় জীবনকে এ ভাবে? সকলেই যে চোখ বুজেই থাকে—খোলে না।

✓ অনন্ত যে তোমার চারধারে প্রসারিত, তোমার পায়ের তলায় তৃণদলের শ্যামলতায়, তোমার কোলের শিশুর মুখের হাসিতে, তোমার আঙ্গিনায় পাখীর ডাকে, সন্ধ্যায় ঝিঁঝির সুরে, নৈশপাখীর পাখার আওয়াজে—কিন্তু আমি শুনবো না, আমি দেখবো না, আমি চোখ বুজে আছি—কার এত স্পর্দ্ধা আমার চোখ খোলে?✓

॥ ২৮শে আগষ্ট, ১৯২৭, আজমবাদ কাছারী।

আজ আমি ও রাসবিহারী ঘোড়া করে একটু খানি যেতেই ভারী বৃষ্টি এল। রাসবিহারী সিং বললে নিকটে এক রাজদূতের বাংলো আছে চলুন।—ঘোড়া ছুটিয়ে দুজনে সেই রাজদূতের বাড়ী গিয়ে উঠলাম। তার নাম সহদেব সিং। বাড়ী মজফরপুর জেলা। রাশি রাশি ফসল ঘরটার মধ্যে গাদা করা, অড়র ভুট্টা ঝুলছে। বললে, বীজ রেখে দিয়েছে। বৃষ্টি থামলে দুজনে ফিরে চলে এলাম।

॥ ২রা সেপ্টেম্বর, ১৯২৭ সাল॥

আজ সকালে মধু মণ্ডলের ডিহির প্রাচীন বলাইল গাছটার ছায়ায় ঘোড়া দাঁড়িয়ে জমি মলালাম। বৈকালে ঘোড়া চড়ে বেড়াতে গিয়ে দেখলাম ভীমদাস-টোলার নীচেকার আলটায় অত্যন্ত জল বেড়েছে—ঘোড়ার এক বুক জল হ'ল পার হবার সময়। ওপারের বটেশ্বরের পাহাড়টা কি অপূর্ব্ব নীল রং দেখাচ্ছে! ডান দিকে লাল রংয়ের অস্ত-আকাশ—উন্মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে একা। সীমাহীন প্রান্তর, ফুলে-ভরা সবুজ কাশবন, অস্ত-আকাশে রক্ত-মেঘ, নীল পাহাড়, ঢালু

দুর্ব্বাঘাসের মাঠ, ধুতুরা ফুলের ঝোপ, উলুখড়ের ঝোপ, বড় পাকুড গাছটার তলায় হলুদ-রাঙা, জরদা রং-এর সন্ধ্যামনি ফুলের বন, এদিকে ওদিকে পাখী ডাকছে, ক্ষেতে গরু চরছে—বাঁধের নীচে জলের ধারে বকের দল বসে আছে, স্নিগ্ধ খোলা মাঠের সান্ধ্য বায়ু—মনটা যেন এই অপূর্ব্ব সীমাহীনতার মধ্যে, দূরপ্রসারী শ্যামল প্রান্তরের মধ্যে ছড়িয়ে ছড়িয়ে গেল।

দূর প্রান্তে চেয়ে চেয়ে ভাবলাম বহুদূরের আমাদের বনজঙ্গলে ভরা অন্ধকার ভিটা, বাঁশবনের কথা। এই সুন্দর অপরূপ শরৎ সন্ধ্যায় গ্রামের লতাপাতা থেকে ওঠা ভরপুর কটুতিক্ত গন্ধটার কথা, সেই বাঁশঝাড়ে শালিখ-ডাকা বাংলাদেশের মায়া সন্ধ্যার কথা, তরুণীরা মাটীর প্রদীপ হাতে গৃহ-আঙ্গিনায় তুলসীমঞ্চে সন্ধ্যা দেখাচ্ছে ঘরে ঘরে রাত্রির আবাহন—মঙ্গলশঙ্খের রব।

এসময়ে চাঁপাপুকুরের পুকুর ঘাটে, তাদের তেতলার ঘরটায়, চট্টগ্রামের দূর প্রান্তের সেই ঘরটাতে, বারিদপুরের বাড়ীটায়, ঝালকাটীর মনিব বাড়ীতে না জানি কি হচ্ছে!

মনি বড় হয়েছে—বোধ হয় বিয়েও হয়ে গিয়ে থাকবে।

আমি স্বপ্ন দেখি সেই দেবতার—যিনি এই নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়, যুগান্তের পর্ব্বত-শিখরে নীরব চিন্তামগ্ন। কত শত জন্মের স্মৃতি, হাজার বৎসরের হাসিকান্নার কাহিনী, নির্জ্জন গ্রহের নির্জ্জন পর্ব্বতে, যুগ যুগ অক্ষয় তরুণ দেবতার মনে পড়ে—ধীর, নির্জ্জন, নীরব ধ্যান শুধু অতীতের। সম্মুখে তার বিশাল অজানা বিশ্ব। দেবতা হয়েও সব জানেনি, সকলের সীমা পায়নি গ্রহে, শত প্রেম কাহিনীর জালে জালে জড়ানো তরুণ সুন্দর মুক্ত তীর। নিস্তব্ধ অন্ধরাতে বসে বসে শুধু সে একমনে অপরূপ জীবন রহস্য ভাবে—ভাবে—

চারধারে বিশ্বের আঁধার ঘিরে আসে, মাথার ওপরে তারা ওঠে, কোন্ সুদূর লোকের পার থেকে অনন্ত অজানার সুর যেন কানে বাজে—একটা ছবি মনে আসে সেটা নীচে আঁকলাম, ছবিটা আমার মনে আছে, কিন্তু আঁকাটা এখানে হবে না, কারণ আঁকতে আমি জানিনে তবুও এইটা দেখে মনের ছবিটা মনে ফিরে আসবে।

॥ ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯২৭ ॥

সকালে আজ কিরকম করে বৃষ্টিটা এল! কাটারিয়ার দিক থেকে ভয়ানক মেঘ করে এল। ঘন কালো মেঘের রাশ ঘুরতে ঘুরতে ঝড়ের মুখে হু হু উড়ে

আসতে লাগলো। মাটিতে জল কি মিশ কালো ছায়াটা ফেললে! বড় অশ্বত্থ গাছের ধারের বন্যার জলটা যে কালো সোনার রং হয়ে উঠল। বকের দল ভয়ে ভয়ে ওপর থেকে মেঘের সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ের মুখে উড়ে উড়ে এপারে আসতে লাগল। কাকের দল কা কা করে ডাকতে ডাকতে দিশাহারা ভাবে উড়ে আসতে লাগল। তারপর এল ভীষণ ঝড়! শোঁ শোঁ শব্দে ভীষণ বেগে গাছপালা লুটিয়ে নুইয়ে ফেলে মেঘগুলোকে ঘুরুতে ঘুরুতে বটেশ্বরের পাহাড়ের দিকে নিয়ে চলল। কোথায় কোন সমুদ্রের জলের রাশি কি কৌশলে মাথার উপর দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে যেন! তারপর এল বৃষ্টি।

বৈকালে ঘোড়া করে বার হয়ে সহদেবটোলার পথটা ধরলাম। দুধারে কেমন বাংলাদেশের মত কাঁটার ঝোপ, তেলাকুচে লতার গায়ে পাকা তুলতুলে সিঁদুরের মত রং তেলাকুচা ফল ঝুলছে। পড়কলমীর নোলক ফুটে আছে, বনসিদ্ধির জঙ্গল, আলোকলতার জলে মটর লতা স্নিগ্ধ বনদৃশ্যকে ভাল করে উপভোগ করবার জন্য আস্তে আস্তে ঘোড়া চলতে লাগল। তারপরে সুথটিয়ার জন্য কুলের জঙ্গল দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে একবারে দেখি সামনে কালোয়ার চকহাট। সেখান থেকে জঙ্গল বেয়ে একহাঁটু জলকাদা দিয়ে ঘোড়া চালিয়ে একেবারে গেলাম কলবীনযার ধারে। কাশবনটার কাছে থেকেই দেখলাম ফিকে হলুদরংয়ের গোল সূর্যটা মেঘের মধ্যে থেকে বেরিয়ে কলবীনযার ওপরে তিরাশী সেকেণ্ড যেন অপেক্ষা করলো—তার পরেই সে তার তপ্ত মুখখানা লুকিয়ে ফেলতে আর দেরী করলো না।

আবার অন্ধকারে ঘোড়া ছাড়লাম। কুলের জঙ্গল দিয়ে, কাশবনের ভেতর দিয়ে, জলকাদা ভেঙে ঘোড়া এসে উঠল গ্রাণ্ট সাহেবের জমির অশত্থ গাছটার কাছে। সেখানে পুরো অন্ধকার হয়ে গেল। একে মেঘান্ধকার, তাতে কৃষ্ণা-পঞ্চমী—ঘোড়াও পথ দেখেনা, আমিও না। পথে একজাগায় অনেকটা জল পার হতে হোল ঘোড়াটাকে। অন্ধকারে অন্ধকারে গোমলা ঘাসের ক্ষেতের মধ্যেকার সুঁড়ি পথ দিয়ে চলে আসতে লাগল। চারধারে লোক নেই, জন নেই, আকাশে একটা তারা নেই। সামনে পড়লো আবার জল, সেই জলটায় আবার কুমীরের উপদ্রব আছে। যাই হোক, ধীরে ধীরে ঘোড়াটাকে জল পার করিয়ে মকাই ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে এক প্রহর রাত্রে কাছারীতে পৌঁছলাম।

॥ ১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৭ সাল ॥

বিকালের দিকে অনেক দিন পরে বেড়াতে গিয়ে যতীনবাবুর দোকানে কথা

বলছি—হেমন্তবাবু টেনে নিয়ে গেলো ম্যাচ্ দেখতে, সেখানে অনেকের সঙ্গে দেখা হ'ল। হেমন্তবাবু উকীল, যতীশবাবু ইত্যাদি। ওখান থেকে ফিরে তুজনে গেলাম হেমেনের কাছে। অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা হ'ল। তারপর ক্লাবে গেলাম। বাসায় ফিরে অনেক রাত পর্যন্ত জ্যোৎস্নাভরা ছাদে বসে রইলাম একা। শুতে যেতে আর ইচ্ছা করে না। ইচ্ছে করে শুধুই বসে বসে এই দীর্ঘ নির্জ্জন রাত্রি ভাবতে আর নানা রকম কল্পনা করে কাটাতে।

আনমনে রচি বসি তন্দ্রাদীর্ঘ দিবসের অলস স্বপন—ভাটপাড়ার সেই বধূ তুটি, যাঁরা বিজয়ার দিনে আমাকে—সম্পূর্ণ অপরিচিত হওয়া সত্ত্বেও আগ্রহ করে ডেকে জলখাবার খাইয়েছিলেন—আজ হঠাৎ তাঁদের কথা মনে পড়ল। সত্যকারের স্নেহ কি ভালবাসার ঘটনা বিফলে যায় না—তাঁদের সে অনাবিল স্নেহের ফল এই হয়েছে যে তাঁরা আমার মনে একদিনের জীবনপুলকের সঙ্গিনীরূপে স্থায়ী আসন পেয়েছেন। আজ এই প্রায় তিন বৎসর পরে এই দূর দেশে যখনই ভাবলাম তাঁদের কথা তখনই আনন্দ পেলাম।

মোঁপাসার সেই পলাতকা লক্ষ্মীছাড়া খুড়োর গল্পটা মনে এল—সেই জাহাজের ডেকে ছোট ছেলেটি যখন তার হতভাগ্য নির্ব্বাসিত খুড়োকে দেখলে তখন তার বালকহৃদয়ের সেই উচ্ছ্বাসিত অথচ গোপন সহানুভূতিটুকু!

তাই মনে হোল সাহিত্যে এই ভাবজীবন ফুটানোর প্রচেষ্টাই আসল। সাধারণ মানুষের ভাবজীবন খুব গভীর নয়—অনেকের মন এমন ভাবে তৈরী যা কিনা কোনো বিষয়েই গভীরত্বের দিকে যাবার উপযোগী নয়। অথচ এই গভীরত্ব অভাবে জীবন বড় অসম্পূর্ণ থেকে যায়। মনের এ দৈন্য অর্থে পূরণ হয়না, ঐশ্বর্য্যে নয়, সাংসারিক বা বৈষয়িক সাফল্যের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। এ সব অপূর্ব্ব অনুভূতি আসে অনেক সময় বিচিত্র জীবনপ্রবাহের ধারার সঙ্গে, উপযুক্ত গড়ে ওঠা মনের সঙ্গে।

এই মোঁপাসার মত লোকেরা আসেন আমাদের এই বড় অভাবটা পূর্ণ করতে। তাঁদের ভাগ্যের লিখন এই, জীবনের উদ্দেশ্য এই। নিজের গভীর ভাবজীবনের গোপন অনুভূতির কাহিনী তারা লিখে রেখে যান উত্তরকালের বংশধরদের জন্যে। হতভাগ্য দীনহীন খুড়োর দৈন্যের করুণ দিকটা একদিন কোন বিস্তৃত তুষারবর্ষী রাত্রে আগুনের কুণ্ডের আরাম কেদারায় বসে মোঁপাসার মনে হয়ে তাঁর চোখে জল এনেছিল, আজ সর্ব্বদেশের নরনারীর চোখে জল আনছে—আজ কতকাল

পরে সেই কল্পনাদৃষ্ট বৃদ্ধ ও তার দীন বাজিকর ছিন্ন বেশ, কয়লা কালিঝুলি-মাখা হাত-পা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি।

সাহিত্য-শিল্পীদের জীবনের প্রতিবিম্ব। সে যুগে তারা জন্মেছে, তাদের চেষ্টা হয় সকল দিক থেকে সেযুগের একটা স্থায়ী ইতিহাস লিখে রেখে যাওয়া। এই বর্ত্তমান যুগে যাঁরা জন্মেছেন, তারা এই সময়ের একটা কাহিনী লিখবেন। অনন্তের এক মুহূর্ত্তের কথা, তবুও জগতের ভাণ্ডারে থেকে যাবে। এই যুগের সেক্সপীয়র হোমার বাল্মিকী কালিদাস রবীন্দ্রনাথ তাজমহাল Great War এই কল-কারখানা, সামাজিক বিপ্লব, এই বিভূতি, শুন্য, ভারতে স্বরাজ নিয়ে মহাদ্বন্দ্ব, বাদলায় এই ম্যালেরিয়া, বার্ণার্ডশ' বা ওয়েল্‌স্ ইবানেজ, মেটারলিঙ্কের প্রতিভা, আমেরিকার ধনী ভ্রমণকারীদের এই পৃথিবীময় ছড়িয়ে যাওয়া, জাপানের ভূকম্পন—এই সবশুদ্ধ জড়িয়ে এই যুগটার নানাদিকের কাহিনী, ইতিহাস লেখা হবে। প্রত্যেক লোকই তার নিজের অনুভূতি লেখবার অধিকারী। ফুল, ফল, লতা, পাখী, সমুদ্র, মা-বাপ, ছেলেমেয়ে সব আছেই—আমি তাদের কি রকম দেখলাম সেইটাই আসল কথা। জীবনটাকে আমি কি রকম পেলাম, সেইটাই সকলে জানতে চায়। যত অজ্ঞাতনামা লেখকই কেন হোক না, তার সত্যিকার অনুভূতি কখনো কৌতূহল না জাগিয়ে পারে না—পড়বেই সেটাকে সকলে। সকলেই খেলার তাঁবুর বাহির দুয়ারে অপেক্ষা করছে—রহস্যভরা খেলাটা সকলের ভাল লাগে কিন্তু ভাল বুঝতে পারে না—তাঁবুর বাইরে এলেই পরস্পরের অভিজ্ঞতার আদানপ্রদান ও তুলনা হয়—'মশাই কিরকম দেখলেন? প্রত্যেক মানুষই নতুন চোখে দেখে—প্রত্যেকেরই অভিজ্ঞতা ভিন্ন ভিন্ন। তাই সকলেরই কথা কৌতূহল জাগায়। সাহিত্য শুধু জগতটাকে কে কি চোখে দেখেছে তারই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাহিনী। বর্ণিত নায়ক-নায়িকার পিছনে শিল্পী তার আবাল্য-দীর্ঘ জীবনের সকল সুখদুঃখ, হাসিকান্না নিয়ে প্রচ্ছন্ন রয়েছেন। কল্পনাও কিছু না কিছু অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করে তবে শূন্যে ভর করে—যেমন সনেটের পিছনে, তেমনি হ্যামলেটের পিছনে সেক্সপিয়ার গুপ্ত থেকেও ধরা দিয়েছেন।

তাই এই যুগে জন্মে আমি সকল রকম বিচিত্র জীবন-ধারার অভিজ্ঞতা চয়ন করে তার কাহিনী লিখে রেখে যাবো। আমি জগতকে কি রকম দেখলাম? আমার শৈশব কি রকম কাটল? কোন্ কোন্ সাথীকে আমি আনন্দ মুহূর্ত্তে দেখলাম? কাদের চোখের হাসি আমার মনকে অমৃতরসে স্নিগ্ধ করলে?

গতিশীল পলাতক অনন্তের প্রবাহ থেকে তাদের উদ্ধার করে লেখার জালে তাদের বেঁধে যাবো—সুদীর্ঘ ভবিষ্যৎ ধরে ভবিষ্যৎ-বংশধরেরা তাদের কাহিনী জানবে। আর হয়তো এ পথে আসবো না, হয়তো আবার যুগযুগান্ত পরে ফিরে আসবো—কে জানে? বহুকাল পৃথিবীর সন্তানগণের মনে এ লেখা এ ইতিহাস কৌতূহল জাগাবে—তাজমহলের ধ্বংসস্তূপ যেন মাহেঞ্জোদারোর মত, গভীর মাটির রাশির মধ্যে যাকে খুঁড়ে বার করতে হবে—Great War-এর কথা মহাভারতের কি হোমারিক যুদ্ধের কাহিনীর মত প্রাচীন অতীতের কথা হয়ে দাঁড়াবে—কলকাতা সহরটা বঙ্গোপসাগরের তলায় ঢুকে যাবে—সেই সুদূর অতীতে নতুন যুগের নতুন শিক্ষাদীক্ষায় মানুষে এ সব কাহিনী আগ্রহের সঙ্গে পড়বে। বলবে—আরে দেখ দেখ, সেই সে কালেও লোকে এমনি ভাবে বিয়ে করতে যেতো! এই রকম জমি নিয়ে মারামারি করত, মেয়ের বিদায়ের সময় কাঁদতো? ভারী আশ্চর্য্য হয়ে যাবে তারা।

যুগযুগান্তের শাসনে জীবন দেবতা বসে বসে শুধু হাসবেন।

॥ ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৭ ॥

আজ অনেকদিন পরে পরিচিত সেই বনটার ধারে গিয়ে বসলাম। সন্ধ্যার আর বেশী দেরী নেই। পশ্চিম আকাশে অপূর্ব্ব রাঙা মেঘের পাহাড়, সমুদ্র, কত বিচিত্র মহাদেশের আবছায়া। সামনের তালবনগুলো অন্ধকারে কি অদ্ভুত যে দেখাচ্ছে! চারধারে একটা গভীরতা, অপরূপ শান্তি, একটা দূর-বিসর্পিত ইঙ্গিত।

এই স্থানটা কি জানি আমার কেন এত ভাল লাগে! যখনই আমি এখানে সারাদিন পরে আসি তখনই আমার মনে হয় আমি সম্পূর্ণ অন্য এক জগতে চলে গিয়েছি। এই গাছপালা, মটরলতা, পাখীর গান, সন্ধ্যাকাশে বর্ণের ইন্দ্রজাল—এ অন্তজগৎ—আমি সেই জগতে ডুবে থাকতে চাই—সেটা আমারই কল্পনায় গড়া আমারই নিজস্ব জগৎ, আমার চিন্তা, শিক্ষা, কল্পনা, স্মৃতি সব উপকরণে গড়া।

নীচের জলাটা যেন প্রাগৈতিহাসিক যুগের জলা—সেখানে অধুনালুপ্ত হিংস্র অতিকায় সরীসৃপ বেড়াতো—সামনের অন্ধকার বনগুলা কয়লার যুগের আদিম অরণ্যানী—আমি এই নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় দেখি কত রহস্য, কত অপরূপ পরিবর্ত্তনের কাহিনী, কত ক'রে ইতিহাস ওতে আঁকা, কত যুগযুগের প্রাণধারার সঙ্গীত।

বড় বাসার ছাদে বসে বসে ছেলেবেলার দুই একটা বড় ঘটনার কথা ভাবতে চেষ্টা করেছিলাম। একটু বিশ্লেষণ করে দেখলাম। এই রকম করে বলা যেতে পারে—শৈশব তো সকলেরই হয়—ওতে ভাববার কি আছে! এ আর নতুন কথা কি? তা নয়। এই ভেবে-দেখাটাই আসল। না ভাবলে ভগবানের সৃষ্টি মিথ্যা হয়ে পড়ে। জগতে যে এত সৌন্দর্য্য তার সার্থকতা তখনি যখন মানুষ তাকে বুঝবে, গ্রহণ করবে, তা থেকে আনন্দ পাবে। নইলে আকাশের ইথারে তো চব্বিশঘণ্টা নানা ভাবের স্পন্দন চলছে, কিন্তু যে বিশিষ্ট ধরনের স্পন্দনের ঢেউএর নাম সঙ্গীত তা অত আনন্দদায়ক হ'ল কেন? দিনের পর দিন সূর্য্য অস্ত যায়, পাখী গান করে, খোকাখুকীরা হাসে—যদি কেউ না দেখতো, না শুনতো—তবে মানুষের দৈনন্দিন বা মানসিক জীবনে তাদের সার্থকতা কিসের থাকতো? কিন্তু মানুষের মনের সঙ্গে যখন এদের যোগ হয় তখনই এদেরও সার্থকতা, মনেরও সার্থকতা। মনের সার্থকতা যে এই বিপুল সৃষ্টির আনন্দকে সে ভোগ করে নিয়ে নিজেও বড় হয়ে উঠল—আত্মাকে আর এক ধাপ উঠিয়ে দিলে—এদের সার্থকতা এই যে এরা সে উন্নতির আনন্দের কারণ হ'ল।

তাই আমাদের শাস্ত্রেও যোগকে অত বড় করে গিয়েছে। এই বিশ্বের অনন্ত আত্মার সঙ্গে আমাদের আত্মার যোগই মানবজীবনের লক্ষ্য। সে কি রকম? মানুষ সাধারণত ছোট হয়ে থাকে—হিংসা-দ্বেষ, অর্থচিন্তা তার কারণ। অনন্ত অধিকারের বাণী সে শোনেনি বলেই সে নিজেকে মনে করে ছোট—বাইরের আলো পায় না বলেই এই দুর্দ্দশা। এই ভূপতিত, ধূলি-লুণ্ঠিত, আত্মাকে উঁচুতে ওঠাতে পারে তার মন। মন মুদিখানার দেকোন থেকে বার হয়ে পোদ্দারী আড্ডা খোলে এসে। বাইরের অনন্ত নক্ষত্র জগতের দিকে প্রশান্ত জিজ্ঞাসু চোখে চেয়ে থাকুক—কান পেতে নদীর মর্ম্মর, পাখীর সুর, রন্ধ্র থেকে উপচীয়মান সঙ্গীত শুনুক—এই হোল যোগ। সঙ্গে সঙ্গে মনকে প্রসারিত করে দিক্ অনন্তের দিকে—এই হোল যোগ! আর সে ছোট থাকবে না—বড় হয়ে যাবে। ঐ অনন্ত শূন্যের উত্তরাধিকারী সে যে নিজে একথা বুঝবে—কি অনন্ত আনন্দ তার জন্যে অপেক্ষা করছে তা বুঝবে—অনন্তের দিকে বিসর্পিত তার আত্মাই তখন তাকে বড় করে তুলবে।

এই অবস্থা ঘটেছিল এক সুদূর অতীতে সেই চিন্তাশীল কবির—যিনি জোর গলায় জ্ঞানের চিন্তার স্পর্দ্ধায় বলেছিলেন—

পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসাঃ পরস্তাৎ—তিনি বুঝেছিলেন ত্বামেব

বিদিত্বাদিমৃত্যুমেতি—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায় ! মৃত্যুকে জয় করে বড় হতে গেলে এই অন্ধকারের পরপারের সেই আদিত্যবর্ণ মহাপুরুষ যাঁকে মহর্ষি নিজে বুঝেছেন এবং বুঝে এটুকুও বুঝেছেন যে তাঁকে না বুঝলে মৃত্যুকে ছাড়িয়ে ওঠবার আর পথ নাই—তাঁকেই জানতে হবে।

যে অমৃত প্রভাতে আদিম ভারতের কোন্ তপোবনে এ মহাবাণীর জন্ম হয়েছিল, সে তপোবনের, সে প্রভাতের বন্দনা করি।

সত্যই তো। অনন্ত বিশ্বকে মানলেই তো মানুষ দেবতা হয়ে ওঠে, তার ওপর এই বিশ্বজ্ঞানকে ছাড়িয়ে তার ওপারে তার কর্ত্তব্যজ্ঞান যে লাভ করেছে সে অতিমানব—এ বিষয়ে ভুল নাই।

অতিমানব সেই, যে চিন্তায় বড়, অনন্তের সঙ্গে যে নিজের আত্মাকে এক করতে পেরেছে।

মনোরাজ্য মানুষের অতি অমূল্য অধিকার। একে খুব কম লোকেই জানে, খুব কমই এর সঙ্গে পরিচিত। ভাববার সময় মানুষে পায় না। অথচ এই মনই মানুষের অন্ধকারে পরপারের জ্যোতির্ম্ময় অনন্ত জীবনের বেলাভূমিতে যাবার একমাত্র অদৃশ্য পুষ্পক রথ।

তোমাকে যে দেশের জঙ্গল কাটতে হবে সেটা ঠিকই, বুভুক্ষিতকে অন্ন দিতে হবে ঠিকই, কিন্তু এটা ভুলে গেলে চলবে না যে চিন্তার দ্বারা তুমি মানবজাতিকে যে আনন্দের স্তরে ওঠাতে পারো সাময়িক একমুঠা অন্নদানে সে সাহায্য হবে না। নিজে বড় হও তারপর সেই আনন্দের বার্ত্তা পরকে শোনাও—আশার বাণীতে তাদের জরামরণ ঘুচে যাবে।

ভগবান তাঁর অনন্ত জীবনের আনন্দ সকলকে বিলিয়ে দিতে চান এই জন্যই যে তাঁর মত উচ্চ জীবের কল্পনা, ধ্যান, বুদ্ধি সকলের হয় এই তিনি চান। তার উপায়ও তিনি করেছেন, তবুও যদি ছোট হয়ে থাকা যায় তবে কে কি করবে ?

সংসারের কলকোলাহলের ঊর্দ্ধে নিত্যকালের মশালচীদের যাবার পথ, তোমার ব্যাকুলতা দেখে তোমার মশাল তাঁরা জ্বেলে দেবেন, নয়তো অনেকের মত তোমার মশাল এমনিই থেকে যাবে।

"Let us not fag in paltry works which serve one not and lag alone. Let us not lie and steal. No God will help. We shall find all their teams going the other way—Charles's wain, Great Beer, Orion Leo, Hercules every God will leave us. Work

(rather for these interests which the divinities honour and promote—justice, love, freedom, knowledge, utility.")

॥ ২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৭ ॥

ভবঘুরের রক্ত আমাকে পেয়ে বসেছিল, তাই আজ বেরিয়ে পড়লাম আমি ও অম্বিকা। সকালে হেমন্তবাবু এসে প্রথম মাইল পোষ্ট পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেল। চারধারে সবুজ ধানক্ষেত, জলাতে কুমুদ ফুল ফুটে আছে, দূরে তাল-গাছের সারি ও নীল পাহাড় শ্রেণীর সীমারেখা। বার মাইল চলে এসে রামবাবুর বাড়ী রয়ে গেলাম। সেখানকার অভ্যর্থনা, পান, করঞ্চার সিরাপ দিয়ে চাটনি কখনো ভুলবো না। রামবাবুর বাগানটিতে ছায়াভরা পেঁপে গাছ ফুলগাছ বড় ভাল লাগল। সেখান থেকে বার হয়ে বৈকালের দিকে কি সুন্দর দৃশ্য। খড়কপুর পাহাড়ের ওপর সূর্য্য অস্ত গেল। পাহাড়ের কি নীল রং, ধানের রং কি সবুজ! সন্ধ্যার সময় এসে রজৌন থানায় পৌছে মুসলমান দারোগাটির আতিথ্য গ্রহণ করলাম। বেশ ভাল লোক—আজকাল এই হিন্দু-মুসলমানে বিবাদের দিন এরূপ আতিথ্য দেখলে বড় আনন্দ হয়—মানুষের আত্মা সব সময়ে যেন বাইরের কুয়াশাতে দিশাহারা হয়ে থাকে না—বরং যখন আপনা-আপনি থাকে তখনই সে মুক্ত, অনন্ত সুখী থাকে—এর আমি অনেক প্রমাণ আগে পেয়েছি, এখানেও পেলাম।

এই থানা, সামনের মৃণাল-ফোটা বৃহৎ পুকুরটা, এই কি সুন্দর হাওয়া—সন্ধ্যার পর এই থানার আয়না বসানো টেবিলটার ধারে বসে লিখছি—এ সব যেন কোথায় এসে পড়েছি!—সেই—এই সময় পাকাটি হাতে শিবাজীর মত যুদ্ধ-যাত্রা মনে পড়ে—সেই মার তালের বড়া ভাজা, কলকাতা থেকে এসে খাওয়া—বাবার দেশভ্রমণের বাতিক—সেই বড় দিনের সময় আমবনের কাছে বেড়ানো······কত পুরাণো দিনের কথা মনে পড়ে। ভগবান, তুমি সামনে টেনে নিয়ে যাচ্ছ—সামনেই নিয়ে চল। সেই সোনারপুরে এমন সময়ে মা মারা যাওয়ার দিনটি থেকে খুব নিয়ে চলছে—সেই কিশোরীবাবুর বাড়ী, জ্যোৎস্নাময় পূর্ণিমার কথা মনে পড়ে।

॥ ২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৭, রজৌন থানা ॥

কাল রজৌন থানা থেকে বেরিয়ে অত্যন্ত খারাপ রাস্তায় মাঠের বাঁকা

আলপথে এসে ভ্রোছুনো গেল। চানন নদীর কুল থেকে কি সুন্দর দৃশ্যটা! গুপিবাবুর বাড়ী সেদিনটা থেকে আজ ভোর পাঁচটাতে জামদহের পথে রওনা হলাম। চাননের বাঁধ থেকে দূরে পূবদিকে তালের সারির আড়াল দিয়ে সিঁদুর রংএর অরুণ আজ দেখা দিচ্ছে—আরও দূরে ডাইনে বাঁয়ে পাহাড—এধারে কাকোয়ারা ওধারে বংশীর পাহাড। পথে কেবলই দূরে দূরে পাহাড়, উঁচু নীচু ঢেউ খেলানো লাল কাঁকরের পথ—চাননের জল স্থানে স্থানে জমে আছে—দূরে দূরে তালের সারি, শাল গাছের বন—রাঙা বালির ওপর দিয়ে শীর্ণকায় নির্ম্মল নদী বয়ে যাচ্ছে—সাঁওতাল পরগণার ছাযামযী অতি পরিচিত অথচ প্রতিবারেই নতুন-মনে-হওয়া ভূমিশ্রী।

সন্ধ্যা সাতটা। ডাকবাংলার টেবিলে নির্জ্জনে বসে লিখছি। নীচের চানন নদী ওপরের পাহাড় অস্পষ্ট অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না—সামনের আম বনেব মাথার ওপর তারা উঠেছে—লছমীপুরের ম্যানেজাব নদীয়া বাবু ও-অংশে কাছারী করছেন—প্রজারা কথাবার্ত্তা বলছে—এই সুন্দর অপবিচযের মধ্যে বসে মনে হ'ল কতদিন আগেকার গানটা—'বিশ্ব যখন নিদ্রা মগন গগন অন্ধকার'—ঠিক এই সময়—কলকাতার বোর্ডিংটা। আজ দ্বিতীযা—সামনেই পূজা আসছে ষোলই আশ্বিন। সেবার পূজা ছিল চব্বিশে। সেই সমযকাব দূরকালের সে জীবনটার সঙ্গে আজকার এই নির্জ্জন জীবনের মধ্যকার এই শালবন বেষ্টিত পাহাড নদী তীরের ডাকবাংলা, এই নিভৃত সন্ধ্যা, এই সম্পূর্ণ অন্য ধরনের জীবনটা মনে পড়ে। আমি এই রকম অতীতের ও বর্ত্তমানের এই রকম বিভিন্ন জীবনযাত্রাব কথা ভাবতে বড ভালবাসি। বড ভাল লাগে, কোথায যেন একেবার ডুবে যাই। আজ সকালে মহিয়ারডি, লকড়ী কয়লা প্রভৃতি অদ্ভুত রকমেব গ্রামগুলো ও অপূর্ব্ব পথের দৃশ্য, অম্বিকাবাবুর ললিত ডেপুটীকে প্রসংশার কথা অনেক দিন মনে থাকবে। কাল সকালে লছমীপুর যাবার প্রস্তাব হয়েছে—দেখা যাক। ভগবান আশীর্ব্বাদ করুন, দেওঘরে অবশ্যই পৌছে যাবো। ডাকবাংলার জলের বড় অভাব—পূরণ ছুটাছুটি করছে। নাগেশ্বর প্রসাদ, লছমী মুন্সী দেওয়ান শ্রীধরবাবুর নামে পত্র নিয়ে আজ সন্ধ্যায় আসে ঘোড়ায় করে লছমীপুর চলে গেল। পায়ে এমন বড় ফোস্কা হয়েছে যে ওপথে বড চড়াই-উৎরাই শুনে একটু ভাবছি। জয়পুর পর্য্যন্ত মিশিরজী পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে ঠিক হ'ল।

আমি এই সব তুচ্ছ·· খুটিনাটি লিখি এই জন্যেই যে, সবশুদ্ধ দিনটাকে ও

তার আবহাওয়াটাকে অনেক দিন পরে আবার ফিরে পাওয়া যাবে। বড় আনন্দ হয়।

॥ ২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৭, জামদহ ডাকবাংলা ॥

জামদহ ডাকবাংলা থেকে বেরিয়ে লছমীপুরের পথে কি সুন্দর দৃশ্যটা দেখলাম—চাননের ওপারে পাহাড়ের মাথার ওপর প্রভাতের অরুণ-আভা, উঁচুনীচু পাহাডের উপত্যকার মধ্যে মধ্যে ক্ষীণস্রোতা নদী—শালবন, বড় বড় পাথরের টিলা। গভীর উপত্যকার মধ্যে শালবনবেষ্টিত লছমীপুর গড়ে এসে পৌছানো গেল বেলা আটটাতে। দেওয়ান শ্রীধরবাবুকে কালিবাড়িতে খবর দেওয়া গেল। লছমীপুর প্রাসাদে পৌছে দেওয়ানখানায় বসে রইলাম। তার আগেই কালীপদ চক্রবর্ত্তী গুরুঠাকুরের ওখানে চা খাওয়া গেল। সেখানে খাওয়া-দাওয়া করে দুর্গম জঙ্গলের পথে হরপুর রওনা হলাম। উচ্চ মালভূমির উপর গভীর অরণ্যের ভিতর দিয়ে পথ। দুধারে খদির, হরিতকী, বয়েড়া, বাঁশ, আবলুশ, আমলকী, কথবেল, বেলের জঙ্গল। প্রথম জঙ্গল পার হয়ে দ্বিতীয় জঙ্গলটা শুধু ঘন আবলুশ ও কেঁদ জঙ্গল। এত বড় বড় পাথর যে জুতা ছিঁড়ে বুঝি পাথর পায়ে ফোটে। অম্বিকাবাবু ভারী বিরক্ত হ'ল—এত গভীর বন দিয়ে কেন আসা? বনে ভালুক, বাঘ ও হরিণ প্রচুর। জঙ্গল শেষ করে রাঙা মাটির উঁচু-নীচু পথ। শালের ও মহুয়ার বন পার হয়ে হয়ে অবশেষে জয়পুরের ডাকবাংলায় পৌছানো গেল। ওঝাজি লছমীপুরের কাছারী থেকে নিয়ে এসে আহার ও রন্ধনের আয়োজন করলে।

বেশ কাটল আজ সারাদিনটা। বনোয়ারী বাবুর কথা যেন মনে থাকে বহুদিন। রাণীসাহেবার এক ভাই এলেন। বাবরীচুলের গোছা, স্প্রিংএর মত কপালে ও মুখের দুপাশে পড়েছে। পকেটে একটা বড় টর্চ্চ যেন একটা পিতলের বাঁশী, হাতে সোনার হাতঘড়ি। রং কালো, আবলুশ কাঠ হার মেনেছে। পথে সাহেবের বাংলা থেকে ও বন থেকে অম্বিকাবাবু কি সুন্দর ফল তুলে নিলে। আমি আমলকী, হরীতকী, বয়েড়া তুলে পকেট বোঝাই করলাম।

এতবড় বন আমি এর আগে কখনো দেখিনি। সারাদিন লছমীপুরের আমলাদের উপর অম্বিকাবাবু ও আমি খুব হুকুমটা চালালাম যাহোক্।

॥ ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৭, জয়পুর ডাকবাংলা ॥

কাল সকালে উঠে গেলাম পূজা দেখতে আমলাকুণ্ডু কাছারী। খাওয়া-দাওয়া সেরে বিকেলে চা খেয়ে সন্ধ্যার একটু আগে ঘোড়া করে বেরিয়ে পড়লাম। আসবার সময় নৌকায় উন্মুক্ত গঙ্গার উপর জ্যোৎস্না কি অমল, উদার···

এই সব জ্যোৎস্নায় যেন কার মুখ মনে পড়ে। এই মৃদু হাওয়ায় তার স্পর্শ আছে ··ছেলেবেলাকার সেই নবীন শিশিরসিক্ত প্রভাতগুলি দিদির মুখের হাসি মাখানো, মায়ের হাসি মাখানো। সেই পাকাটির গন্ধ, নতুন গ্রামে এসেছি, একটু একটু ভারী ম্যালেরিয়াভরা যেন হাওয়াটা, উঠানে শিউলিফুল ফুটেছে, সম্মুখে বিস্তৃত অজানা জীবন মহাসাগর। সেই রঘুনাথজী হাবিলদারের কালো তরুণ চোখদুটি ও শিবাজীর হাতের কম্পায়মান উন্নত বর্শা মনে পড়ে।

নবীন তাজা প্রভাতে পূজার ঢাক বাজছিল গ্রামান্তরে ছাব্বিশ বছর আগে—ছাব্বিশ বছর আগের পাখীর দল, ফুলের গুচ্ছ আমার গ্রামের পথে পথে বনে বনে অমর হয়ে আছে।

এই যে আজ পূজাতে কহলগাঁতে ঢাক বাজে, পঁচিশ বছর আগে কি বেজেছিল ঠিক এই রকম! এই রকম হাসিভরা ছেলেমেয়ের দল···তারা কোথায় সব চলে গিয়েছে। আড়াই শত বছর পরে যারা আসবে তারা অনাগত ভবিষ্যতের সম্পদ, তাদের ভেবে মন কেমন মুগ্ধ হয়।

কয়দিন সুরেন বাবুর ওখানে রামচন্দ্রপুর কাটিয়ে আজ হেঁটে ফিরে এলাম। কয়দিন বেলিবনে বসে বসে কি আড্ডা! কাল বৈকালে চক্রতোর নদীর ধারে বেড়াতে বেড়াতে কত কথা গল্প হ'ল। আমি, সুরেনবাবু ও মুরলীধর নদীর ধারে ঘাসে বসে অস্তগামী সূর্য্যের দিকে চেয়ে চেয়ে বর্ত্তমান স্যাহিত্যের প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করছিলাম।

শেষ রাত্রে জ্যোৎস্না উঠলে রওনা হলাম। সকালে আটটার মধ্যে ভাগলপুর এসে দেখি মেজ মামা এসেছেন।

॥ ৪ঠা অক্টোবর, ১৯২৭, ভাগলপুর ॥

সুরেনবাবুর ওখান থেকে গেলাম C. M. S. Schoolএ। সেখান থেকে এসে নির্জ্জনে বহুক্ষণ অন্ধকারে বসে রইলাম।

মানুষ কি ধূলায় গড়াগড়ি দিতে জন্মেছে? তার অদৃষ্ট কি তাকে শস্যক্ষেত্রে ফসলের আঁটি বাঁধতেই চিরকাল চালিয়ে নিয়ে বেড়াবে? তামাকের দোকানে পোদ্দারের নিক্তির সাহায্যে, মণিকারের কষ্টিপাথরের সঙ্গে সুপরিচয়ের বন্ধনে?

যে মানুষের চারধারে গহন অসীম বিস্তৃত, মাথার ওপরে শূন্যে এখানে ওখানে ক্ষণে ক্ষণে মিনিটে চার পাঁচটা করে কত না-জানা প্রাচীন জগতের ভাঙা টুকরোর তারাবাজি ধূমভস্মে পরিণত হচ্ছে, যে শান্ত সন্ধ্যায় পাখীর গানে নদীর মর্ম্মরে রক্ত সূর্য্যের অস্ত-আভায় অনন্ত জীবনের স্বপ্ন দেখে—পাথরে কাপড়ে ক্যান্‌ভাসে নব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টিকর্ত্তা বড় ধর্ম্ম প্রচার করেছে, কত লোককে কাঁদিয়েছে, নক্ষত্রজগৎকে চিনিয়েছে, ভগবানের সত্তাকে আন্দাজ করেছে—তার অদৃষ্ট কি পৃথিবীর ধূলোর সঙ্গে সত্য সত্যই জড়িত থাকবে ?

বিশ্বাস হয় না। মনে হয় কত দূর দিনে ঐ সমস্ত বিশাল নাক্ষত্রিক শূন্যের সে হবে উত্তরাধিকারী। অসীম ব্যোমপথে নব নব গ্রহ তারার অজানা সৌন্দর্য্যের দেশে তার যে অভিযান এখন সে মনে ভাবতেও সঙ্কুচিত হয়, তখন তা হবে নিত্য নূতন আনন্দের পুষ্পবীথি। মানুষের ভবিষ্যৎ অদ্ভুত, উজ্জ্বল, রহস্যময়, রাত্রির অন্ধকারে—এই নির্জ্জনে বসে স্পষ্ট তখন দেখতে পেলাম।

সত্যিই আর ভয় করি না, নিরানন্দ বোধ করি না। মানস-সরোবরের শতদল পদ্মের মত এই অনন্তের বোধ আমার প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে যেন। যখন তখন নীল আকাশের দিকে চাইলেই মনে হয় আমার এ দুর্দ্দিনের প্রবাস অনন্তের খেয়ার এপারের ঘাট পারানীর ছোট কুঁড়েখানা। ঐতো কানে আসছে উদ্দাম গহন গভীর সাগরের ক্ষুব্ধ উদাত্ত সঙ্গীত। কুঁড়ের চাল ভুলে যাই। পুঁই মাচার কথা মনে থাকে না। লাউশাকগুলো গরুতে খেয়ে ফেললে কিনা দেখবার কার মাথাব্যথা পড়েছে ?

শতজন্মের পারে তাকে যেন আবার পাবো ? কোন্ দেবতা আছেন যেন জন্ম-মৃত্যুর নিয়ন্তা। তিনি সব দেখেন শুনেন।

কতদিন আগে এই সময়ের সেই গানটা মনে পড়ল :

'তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে যতদূরে আমি ধাই'

॥ ২৯শে অক্টোবর ১৯২৭, ভাগলপুর ॥

আজ সকালে মাহেন্দ্রু ঘাট থেকে ষ্টীমারে হরিহরছত্র মেলা দেখতে গিয়ে কত কি দেখলাম। ভেটারীনারী হাসপাতালে জিনিসপত্র রেখে টম্‌টমে বেরুলাম। কি ভিড়, ধূলো ! সেই যে মেয়েটী ধূলায় ধূসরিত কেশ নিয়ে বসে আছে, ভারী সুন্দর দেখতে। হাতী বাজার, উট বাজার, চিড়িয়া বাজার—কত সাহেব মেম ধূলি ধূসরিত হয়ে মেলা দেখে বেড়াচ্ছে। হাজিপুর থেকে, মজঃফরপুর থেকে

ট্রেন সব আসছে, লোক ঝুলতে ঝুলতে আসছে বাইরে। একটা ঘোড়া কেমন নাচতে নাচতে এল। টম্‌টম্‌-ওয়ালারা চীৎকার করছে—'ধাক্কা বাঁচাও।' একটি মেয়ে কাঁদছে, তার স্বামী কোথায় গিয়েছে—পাত্তা পাচ্ছে না। সাবণ জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের তাঁবু পড়েছে।

।'সন্ধ্যা. ৬টা, ৭ই নভেম্বর, ১৯২৭, রেলওয়ে কম্পার্টমেণ্ট, সোনপুর॥

জ্যোৎস্নাভরা রাতে পুঁটুলি হাতে এইমাত্র এসে পাটনায় পৌছান গেল। বৈকুণ্ঠবাবুর সাজানো অফিস ঘরে টেবিলটাতে বসে লিখছি। গঙ্গায় খুব বড় একটা ষ্টীমার, নাম মুজঃফরপুর—তাতেই পার হওয়া গেল। এপারে ওপারে কি ভয়ানক ভীড়! গঙ্গার ধারে দীঘা ঘাটে ও পালেজা ঘাটেই এক এক মেলা বসে গিয়েছে। জ্যোৎস্নালোকিত গঙ্গাবক্ষে হু হু হাওয়ার মধ্যে যখন জাহাজ ছাড়ল তখন কল্পনা করলাম ইজিপ্ট থেকে যেন জাহাজ যাচ্ছে—ওপারে সুন্দরী ইটালীতে। মাঝের ভূমধ্যসাগরের চলোর্ম্মি-চঞ্চল নীল বারিরাশিকে কতকাল আগেকার কত নীলনয়না কণক-কেশিনী সুন্দরীর ছবি যেন দেখলাম, কত ক্লিওপেট্রা, কত হাস্যমুখী তরুণী, ইটালীর মেয়ে, গ্রীসের মেয়ে, রোমের মেয়ে। লোকের ভিড়ে ষ্টীমারের ঘাটে নামা যায় না, মালগাড়ীর মধ্যে ওয়েটিং-রুম, টিকেট দেওয়ার ঘর—যেন যুদ্ধের সময়ের বন্দোবস্ত। আসবার সময় কেবলই মনে হতে লাগল—এই বিদেহ—মিথিলা। এটা ছাপরা জেলা হলেও কালকাসুন্দে গাছের একটা ছায়াভরা ঝোপ দেখে বাংলাদেশের কথা একবার একটু মনে হ'ল—অবশ্য ঐ পর্য্যন্তই মিল। এদেশের শ্যামলতাশূন্য ভূমিশ্রীর মধ্যে কি আর মরকতশ্যাম-শ্রীর তুলনা হয়? সেই মাকাললতা দোলা বৈকালের ছায়াপড়া ঝোপঝাপ, নদীতীর, পাখীর ডাক, ঘন বন, লতাপাতার কটুতিক্ত সুগন্ধ, বনফুলের সৌরভ। দীঘাঘাট থেকে গাড়ী ছেড়ে আসবার সময় মনে পড়ল—গিরীনদাদার মুখে শুনতাম দীঘা-ঘাটের ওপারে প্যালেজা ঘাট। কখন দেখিনি। এত কাল পরে সে সাধ মিটলো। আরও মনে পড়ল, গিরীনদাদা তাঁর পরিবারবর্গ নিয়ে বহুকাল আগে—আজ একুশ বছর আগে—এই পথে প্রথম বারাকপুর গিরি বাড়ী তৈরী করেন। তারপর আমাদের যে মুগ্ধ শৈশব কেটেছে, কৈশোর কেটেছে—প্রথম যৌবন, বনগ্রামের বোর্ডিং, গর্দ্দভ উপাধি, বেচু চাটুয্যের ষ্ট্রীট, মনে মোহন সেনের লেন, পানিতর, কত কাণ্ড ঘটে গিয়েছে। এখন তিনি কি করছেন? গঙ্গায় আসতে আসতে ষ্টীমারে চা খেতে খেতে ভাবছিলাম বহুদূরে চাঁপাপুকুরের ঘাটটার কথা।

সেই পুকুর ঘাটের বাঁধা পৈঠায় এই জ্যোৎস্নালোকে এখন কি হচ্ছে? সময়ের গতি আগে থেকে কত সামনে চলে এসেছে যে! আজ যদি এক্ষুনি আবার সেখানে যাই? সেই বাড়ী আছে, সেই পুকুরঘাট আছে, সেই ঘরদোর আছে কিন্তু সে মানুষ কৈ? পাটনা যেন হয়ে গিয়েছে বাড়ী। পাটনায় এসে বড় ষ্টেশনে গিয়ে বক্তিয়ারপুরের গাড়ীর সময় জিজ্ঞাসা করে নিলাম। বৈকুণ্ঠ বাবু ও তাঁর চাপরাসী প্লাটফর্ম্মে পাঞ্জাব মেল ধরবার জন্যে দাঁড়িয়ে দেখলাম। তারপর পুঁটুলি হাতে জ্যোৎস্নাভরা রাজপথ দিয়ে হেঁটে আসতে আসতে মনে মনে হ'ল কি ভবঘুরেই হয়ে পড়েছি! কোথায় বাড়ীঘর আর কোথায় সাবন জেলা, পাটনা জেলা, গয়া জেলা ক'রে কত দিনটা কাটালো। সেই আদিনাথ পাহাড়, আগরতলা, কুমিল্লা, উজীরপুর সেই রাত্রে খালে বেড়ান, ইসলামকাটি সেই জয়পুর ডাকবাংলা—চানন নদী, শালবন। পাটনা ল প্রেসের কাছে এসে কল্পনায় আমাদের গ্রামের বাড়ীতে ফিরে গেলাম।

—ও মা—মা?

—দোর খুলে গেল।—'কে বিভূতি?'

মণি এল, জাফরী এল, ন্টু এল। মাকে জিজ্ঞাসা করলাম, কালী বাড়ী আছে?'

ওধারে নেড়ার বাবা কাশছে। বাড়ী—বাড়ী, কতদিন পরে নিজের পুরোনো ভিটাতে মার কাছে গিয়েছি?

কিছুই না অবিশ্যি। ছাতিমফুলের ঘন গন্ধ বেরুচ্ছে। একটা মোটর আসছে—সরে দাঁড়ান গেল। একটা লোক আমাকে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বললে আপ কাঁহা যাইয়েগা? ভাবলে বুঝি পথ হারিয়ে গেছি। বৈকুণ্ঠ-বাবুর বাড়ী এসে সারাদিনের মেলার ধুলো বেশ করে ধুয়ে আরাম করে অফিস ঘরের টেবিলে বসে লিখছি, কিন্তু কি বিকট মশার উৎপাত!

॥ রাত নটা, ৭ই নভেম্বর, ১৯২৭, পাটনা ॥

একজন পুরোনো আমলের বিদ্যার্থীর পাথর-বাঁধানো শোবার যায়গায় বসে লিখছি। কোন্ বিদ্যার্থীর সুখে-দুঃখে মণ্ডিত ছিল হাজার বছর আগেকার এই প্রাচীন দিনের কোঠাটি—এই বিদ্যার্থীর আমলটি কে জানে? কোন দেশ থেকে শেষ বিদ্যার্থী এসেছিল? কি ছিল তার ইতিহাস? কে তার বাপ-মা? তার তার কোন আনন্দভরা শৈশব-কাহিনী? কোন দেশে কোন নদীর ধারের শ্যামল

বন তার কৈশোরকে স্বপ্নমণ্ডিত করেছিল? কত শুভ অবসরে তার বাপমায়ের কথা ভাবতো—হয়তো তাদের তরুণী নববিবাহিতা বধূরা শতদ্রু, গঙ্গা—অজানা কোন গ্রাম্য নদীর তীরে তাদের প্রতীক্ষায় বিরহাকুল হৃদয়ে দিন গুণে গুণে দেওয়ালে আঁচড় কেটে রাখতো—হাজার বছরের দুয়ার দিয়ে কতকাল আগে—সে সব ছাত্র, সে সব অধ্যাপক, তাদের বাপ-মা কোথায় স্বপ্নের মত কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে! অদূরের রাজগৃহের প্রাচীন কোন্ রাজার কোষাগার আজ অন্ধকার রুদ্ধবায়ু ভূগর্ভের কুক্ষিতে গুপ্ত,—ইট, মাটি কাঠের স্তূপের আড়ালে সে সব দিনের কথা বসন্তের ফলের মত ঝরে গিয়েছে। এদেরও সুখ-দুঃখ, আশা নিরাশা, মিলন-বিরহের বাঁশিও আজ হাজার বছর ধরে এই নির্জ্জন প্রান্তরের হাওয়ার নিঃসীম শূন্যে কানে কানে তাদের রহস্য কাহিনী গান করে এসেছে!

॥ ১১ই নভেম্বর, ১৯২৭, নালন্দা ॥

একটা প্রাচীন সাম্রাজ্যের গর্ব্বদৃপ্ত রাজধানীর উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি। দুটো রাজগিরি মাটির তলে অন্ধকারে চাপা পড়ে আছে। কেবলই মনে হয়, এত প্রাচীন দিনের রথ, সৈন্য, কোলাহলভরা জয়দৃপ্ত পথ, চৈত্য, স্তূপ, কত রাজনৈতিক, কবি, সেনানায়ক, মন্ত্রী, তরুণ-তরুণী, বালক-বালিকা, শ্রেষ্ঠ, পুরোহিত যেন মাটির তলে কোথায় চাপা রয়েছে। তাদের সমাধির উপর দিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছি। মহাভারতের যুগের কথা, তার ছবি—কতকাল আগে ভীম বলে যদি—কোনকালে থেকে থাকেন, তবে তিনি এসেছিলেন—সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল সেই ছেলেবেলার দিনের জানলায় বসে দুপুর রোদে এই জরাসন্ধের কারাগারের কত ছবিই যে দেখেছি!

আমি বেশ মনে ভাবছি—পুরোনো সে যুগের এক তরুণ সেনানায়ক মগধের দূর প্রান্ত থেকে যুদ্ধ জয় করে ফিরে এসেছিল তার বাড়ী ফিরে আসা তার বিরহী মনটার তৃষ্ণা—আবার মা, বাপ, ভাই, বোন ও নববধূর সঙ্গে মিশবার যে আকাঙ্ক্ষা—হাজার হাজার বছর পরে যেন আমার মনে এসে বাজছে। ছায়ার মত, স্বপ্নের মতো, তারা কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে কতকাল আগে।

পাহাড়ে পাহাড়ে জংলীবাঁশের বনে শেষ মধ্যাহ্নের ম্লান রোদের মধ্যে, বুনো পাখীর কাকলীর তানে, কতকাল আগেকার মিলিয়ে যাওয়া আশা, দুঃখ, সুখ, হর্ষ, প্রেম ও স্নেহের তান করুণ হয়ে ওঠে।

এই দুই পাহাড়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে ঘন জঙ্গলে বসে আছি ময়নাকাঁটা, বুনো

বাঁশ, সেঁয়াফুল, কত কি বুনো গাছপালা। কি নির্জ্জন স্থান—এই পর্ব্বত-বেষ্টিত স্থানে বোধ হয় প্রাচীন রাজগৃহ ছিল। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকের ভাব ও চিন্তাদৈন্য দেখলে মনে বড় কষ্ট হয়। এত নিকটে এমন স্থান আছে—প্রাচীন বেবিলনের মত গৌরবশালী ধ্বংসস্তূপ যার—তার কেউ একটা ভালরকম সন্ধানও দিতে পারলে না বাক্তয়ারপুর থেকে!

অনেক কাল পরে একজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা হোল। College days এ তার মধ্যে gifts ছিল। কিন্তু interests বড় limited হয়ে গিয়েছে। তার পরে সংসারে পড়ে অর্থার্জ্জন ও তুচ্ছ যশাকাঙ্ক্ষায় তার সব মন, বুদ্ধি, শক্তি ব্যয়িত হয়েছে পঁচিশ বছর পূর্ব্বে সে দীপ্তমুখ বালককে এই অকাল-বৃদ্ধ, অপ্রসন্ন মুখ নিস্তেজ, প্রৌঢ় ভদ্রলোকের মধ্যে খুঁজে পেলাম না।

মনে বড় কষ্ট হোল। এই রকম করেই জগতে অনেক লোকের জীবন ছাই চাপা পড়ে যায়। প্রথম কারণ—কল্পনার অভাব, দ্বিতীয়—তারা দিক্‌চক্রবালের দূরসীমার প্রান্তের সবুজ বনরেখার সন্ধান পায় না, মাথার ওপরকার ছাদের কড়িবরগায় তাদের অনন্ত আকাশের ছায়াপথকে আড়াল করে রেখেছে। জীবনে বড় আনন্দকে ধ্যানে আগে পেতে হয় এবং ধ্যান ভিন্ন তার সন্ধানই মিলে না। হৈ-হাই বাজারের মেছোহাটার কলরবে ধ্যানকে কখনো আসনপিঁড়ি হয়ে বসতে সুযোগ দেয়নি এরা। সে বেচারী সুযোগ খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে তারপর কম্বল গুটিয়ে অসাফল্যের পথ চেয়ে অন্তর্হিত হয়েছে। তারপরেই আসছে সাহেবকে প্রসন্ন করে মাইনে বাড়াবার চেষ্টা। কোন ফন্দিতে বেশী ব্রিফ্ যোগাড় করতে পারা যাবে·সেই ভাবনা। এর ওপর মেয়ের বিয়েতো অবিশ্যি আছেই।

কেউ এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না। কে খবর রাখে মগধ! আর কে খবর রাখে এই ভূমি পবিত্র হয়েছিল সে প্রাচীনকালে ভগবান বুদ্ধদেবের পূত চরণরেণু স্পর্শে? তারা শুধু তাড়াতাড়ি ব্রহ্মকুণ্ডে একটা ডুব দিয়ে বিষ্ণুমূর্ত্তির পায়ে একটি ফুল ফেলে দিলে আবার জোগাড় করবার জন্য ছোটে। এই বিশাল পাহাড়শ্রেণী, এই নির্জ্জন স্নিগ্ধ বনভূমি, এই ভূগর্ভস্থ প্রাচীন দিনের সব চেয়ে বড় সাম্রাজ্যের রাজধানী তাদের মনে খোরাক যোগাতে পারে—তারা তার উপযুক্ত নয়।

॥ ১৩ই নভেম্বর, ১৯২৭, রাজগিরি ॥

কালীর সঙ্গে ৫।৬টা দিন বেশ কাটল। সময়ে সময়ে পুরোনোদিনের

ছেলেবেলাকার গল্প-সল্প করা যেত ! রাজগৃহ বেড়াতে গেলাম, নালন্দা গেলাম— যেমন বাল্যকালে আমরা দুজনে কুঠির মাঠে, মরাগাঙের ধারে বেড়াতে যেতুম, তেমনি। বাবার মুখে গান পুরোনো সুরে বহুদিন পরে তার মুখে শুনতাম। আবার সেই সব শৈশবের আনন্দ ফিরে এসেছিল।

কাল সকালে পাটনা গিয়েই বৈকুণ্ঠবাবুর মুখে শুনলাম যে এখনই ভাগলপুর যেতে হবে। তখনই লুপ্ Express এ রওনা হলাম। বক্তিয়ারপুর ষ্টেশনে ওদের মশারী ও গায়ের বোতাম ফিরিয়ে দিয়ে গেলাম। আজ সকালে ইন্সিওরেন্সএর এজেন্ট ভদ্রলোক বলছিলেন কাল নাকি অমরবাবুর বাসা থেকে সকালে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা গিয়েছিল। অসম্ভব নয়, কালকার দিনটা ছিল খুব ভাল। আমি কাজরা ষ্টেশনের বাঁকটায় এসে ট্রেন থেকে ঠিক বেলা চারটার সময় পূর্ব-উত্তর কোণে দিক্‌চক্রবালে মিছরীর পাহাড়ের মত শুভ্র, ঈষৎ সোনালী রংএর একটা পর্ব্বতশ্রেণীর মত লক্ষ্য করছিলাম বটে। হয়তো সেটা মেঘ, কিন্তু হতেও পারে হয়তো বৈকালের নির্ম্মুক্ত আকাশে দূর থেকে হিমালয়ের তুষার শিখরই চোখে পড়ছিল।

Hugh Walpoleএর কথাটা বড় মনে লেগেছিল সেদিনকার Englishman-এ :

"The establishment of a contemplative order. Anyone above so, should retire to a quite valley, free from motors and radios and spend sometime in silence and contemplation—amidst green woods and quietness of chirping of wild birds beneath a blue sky—if possible by the side of running brook."

চমৎকার কথা ! জগতে এখানে ওখানে সত্যিকার মানুষেরা সব আছে, যাদের মুখে মাঝে মাঝে ভারী খাঁটী কথা সব শুনতে পাওয়া যায়।

॥ ১৬ই নভেম্বর, ১৯২৭ ॥

অমরবাবুর ওখান থেকে গল্প করে ফিরে কেদারবাবুর বাড়ীতে রামায়ণ গান শুনে বাসায় ফিরছিলাম।

পথে আসতে আসতে অনেক কালের একটা গল্প মনে পড়ল। আমার পলিসির অধ্যবসায়ের ঘটনাস্থল ছিল নবীন চক্কোত্তির বাড়ীর এদিকের এড়ো ঘরটা। এই গল্পটার ঘটনাস্থলও ছিল তাই। কোন এক ভগ্নপোতে মহাসমুদ্রের

কোন অংশে জানিনা অন্য সব যাত্রী, মাঝি-মাল্লাকে নামিয়ে দিয়ে জাহাজের অধ্যক্ষ অবশিষ্ট একটামাত্র লাইফবেল্ট পরতে যাচ্ছেন—এমন সময় তাঁর চোখে পড়লো জাহাজের এক কোণে এক ক্ষুদ্র অপরিচিত বালক শীতে ভয়ে ঠক্ ঠক্ কাঁপছে। সে একজন styaway—লুকিয়ে জাহাজে চড়ে কোথায় যাচ্ছিল—এতদিন খায়নি, ভয়ে ও অনাহারে মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছে। মহানুভব পোতাধ্যক্ষ তাকে তাঁর জীবনরক্ষার শেষ উপায়টা দিয়ে মৃত্যুর জন্য নিজে প্রস্তুত হলেন এবং অল্পক্ষণেই ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সমুদ্রের তরঙ্গের গর্ভে পোতসহ নিমজ্জিত হয়ে গেলেন।

সেই কাপ্তেনের ছবিটা বেশ দেখতে পেলেম। পর্তুগালের কি স্পেনের কোন দ্রাক্ষালতার বনের ধারে বসে নীলনয়ন-বালক আপন মনে নির্জ্জনে দূর দেশের স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকতো—আটলান্টিক্ পার হয়ে অজানা দেশের ধনভাণ্ডার লুট করে তাঁর দেশের নাবিকের প্রাচীন কোলে দেশকে ধনশালী করে ক্ষমতাশালী করে রেখে গিয়েছে—তারও মনে মনে ইচ্ছা যে সেও একদিন সেইরকম হবে। কর্টেজ কি পিজারোর মত রাজ্যস্থাপয়িতা দিগ্বিজয়ী বীর নাবিক। তারপর তার দরিদ্র পিতামাতার কুটীরে পোড়ারুটি খেয়ে শুয়ে রাত্রে ঘুমের ঘোরে সে দূরের স্বপ্নে আকুল হয়ে উঠতো। পিতামাতার অনেকগুলো ছেলেমেয়ে, কেউ ভাল খেতে পায় না। শিক্ষার সুযোগই বা কে দেয়? একদিন স্বপ্নের সৌন্দর্য্যে আকুল হয়ে বালক বাড়ী থেকে পালিয়ে চলে গেল। তার কেউ খোঁজখবর করলে না। ক্রমে সকলে ভুলে গেল তাকে।

কেবল তার মা তাকে মনে রাখলে। ধর্ম্ম-মন্দিরে উপাসনার সময় সঙ্গীহীন, সেই নীলনয়ন পলাতক ছেলেটি তার ছিল নিত্যসঙ্গী। কত নির্জ্জন রাত্রের চোখের জলে, রোগশয্যায় বিকারের ঘোরে তার কিশোর মূর্ত্তি চোখে পড়েছে। মা যখন মারা গেল, ছেলে তখন শৈশবের তার স্বপ্নকে স্বার্থকতার মধ্যে পেয়েছে।

কত কাল চলে গিয়েছে—কত দেশের কত অদ্ভুত জীবন প্রবাহের মধ্যে দিয়ে সে বালক এখন প্রৌঢ় পোতাধ্যক্ষ। বিবাহ সে করে নি—বিশাল মহাসমুদ্রের তরঙ্গ-সঙ্গীত তার জীবনের বীণাকে চিরকাল রুদ্রতালে বাজিয়ে এসেছে। সংসারের কোন বাঁধন নেই তার। অচিনের অনন্ত পথ ছেলেবেলাকার মতই তার সামনে তবুও বিস্তৃত।

ভীত, জড়সড়, ক্ষুদ্র বালককে দেখে সে মরণের রাত্রে তার নিজের দূর শৈশবের কথা মনে পড়ল। এই রকম অবোধ, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য বালক ছিল সে যখন প্রথম অজানার টানে সে বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে যায়। এই বালকও আজ সেরকম

বেরিয়েছে, কিন্তু হতভাগ্য প্রথমবারেই জীবনকে বিপন্ন করে বসেছে। বালকের জীবনের বিস্তৃততর সুখ, আনন্দকে প্রসার লাভ করবার সুযোগ দেওয়ার জন্যে সে নিজের লাইফ-বেল্ট তখনি খুলে তাকে পরিয়ে দিয়ে বললে—'বন্ধু, তোমারই মত বয়সে আমিও বাড়ী ছেড়ে পালিয়েছিলাম, আমার জীবন তো শেষ হয়ে এসেছে—তুমি বাঁচো, ভগবান তোমায় রক্ষা করুন।'

আজ এই রাত্রে পড়াশুনার একটা অদম্য পিপসা মনের মধ্যে অনুভব করছি। এক লাইব্রেরী বই পাই, সব বিষয়ে খুব বসে বসে পড়ি। বিজ্ঞান কাব্য উপন্যাস—দেশবিদেশের কবিদের ও ঔপন্যাসিকদের বই পড়তে বড় ইচ্ছে করছে। জীবন বড় ক্ষণস্থায়ী। অন্য ব্যাপারে নষ্ট করে কি করবো? শুধু পিপাসা—আমার এ পড়াশুনার পিপাসা দেখছি বিকারের তৃষ্ণার মত। যত জল খাই, আরও জল, আরও জল। ততই গলা শুকিয়ে যাচ্ছে।

॥ ১৭ই নভেম্বর, ১৯২৭ ॥

এইমাত্র থিয়েটার দেখতে যাবো। টিকিট কিনেছি। বড় বাসার নির্জ্জন ছাদটার নির্জ্জন শীতসন্ধ্যায় গঙ্গার বুকের শেষ রোদ মিলিয়ে যাওয়া ঝিকিমিকি ছায়াভরা রোদের রেশটুকুর দিকে চেয়ে চেয়ে দূর ইচ্ছামতীর বুকের একটা অন্ধকার ঘন তীরের কথা মনে পড়ল। ঠিক এই সময়ে—"যতবার আলো জ্বালাইতে যাই, —নিভে যায় বারে বারে—" সেই শীতের বিষণ্ণ প্রভাতে গাওয়া গানটির কথা মনে আসে। সেই সন্ধ্যা—সেই দোকান।

যাক সে কথা। আকাশের দিকে এখানে ওখানে দু'একটা নক্ষত্র জ্বলছে। দেখে মনে হ'ল এই পৃথিবীটুকুই কেবল জানা—তার ওপারে অনন্ত অজানা মহাসমুদ্র। কোথায় Sirias, Vega, Spiral nebula, বর্হিষদ্ পিতৃলোক! মরণলোকের যাত্রীদের যাতায়াতের বীথিপথ। অনন্ত, অজানা সেই সেই ছেলেবেলার রাজু গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় পড়তে যাবার সময় চারিধারের বাসবনে যেমন অজানা দেশ লুকিয়ে থাকতো—গুপ্তধনের দেশ তেমনি ঠিক।

ক্লাব থেকে আভাসবাবুর সঙ্গে থিয়েটার দেখতে গেলাম। অমরবাবুকে দেখলাম—কথাবার্ত্তা হোল। "ষোড়শী" বইখানা শুনেছিলাম খুব ভালো। কিন্তু একটু সন্দেহ নিয়েই গিয়েছিলাম মনে মনে। শেষ পর্য্যন্ত দেখলাম সে সন্দেহ করে আমি শরৎবাবুর প্রতিভার প্রতি অবিচার করেছি। বই বেশ ভাল লাগল। ওরকম নূতন ধরনের কথাবার্ত্তা বাংলা ষ্টেজে বোধ হয় বেশী নেই।

পরদিন বড়বাসার ছাদে বসে বসে সন্ধ্যাবেলা ভাবছিলাম অনেক কথা। জীবনে কত ভাল জিনিষ পেয়েছি সে কথা—আগাগোড়া ভেবে দেখলাম। কি গ্রামেই জন্মেছিলাম! এইতো আরা জেলা, ছাপরা জেলা ঘুরে এলাম। কোথায় সেই পরিপূর্ণ, সুন্দর, স্নিগ্ধ শ্যামলতা, সেই বাঁশবন ঝোপঝাপ। বড় ভালবাসি তাদের, বড় ভালবাসি, বড় ভালবাসি। কেউ জানেনা কত ভালবাসি আমি আমার গ্রামকে—আমার ইছামতী নদীকে, আমার বাঁশবন, শেওড়া ঝোপ, কোঁদালীফুল, ছাতিমফুল, বাবলা বনকে। সে ছায়া সে স্নিগ্ধস্নেহ আমার গ্রামের, সে সব অপরাহ্ন—আমার জীবনের চিরসম্পদ হয়ে আছে যে।…তারাই যে আমার ঐশ্বর্য্য। অন্য ঐশ্বয্যকে তাদের কাছে যে তৃণের মত গণ্য করি।

এই শীতের অপরাহ্ন, রাঙা রোদ যখন বাবলা বনে লেগে থাকে তখন শৈশবে কতদিন শ্যামছায়া ঘনিয়ে আসা ইছামতীর তীরে নির্জ্জনে বসে বর্ষার ভাঙ্গনের শিমুলতলার দিকে চেয়ে জীবনের মরণের পারের এক রহস্যময় অজানা অনন্ত-লোকের স্বপ্ন আবছায়া আবছায়া ভাবে মনে আসতো—কতদিন চেয়ে থাকতাম শিমুলতলার নীচে লক্ষ্মণ জেলের শাশুড়ি ক্ষুদে গোয়ালা যখন মারা গেল, তাদের পোড়ানোর জায়গার দিকে—কেমন যেন উদাস উদাস ভাব, দিগন্তবিস্তৃত মাধবপুরের উলুখড়ের মাঠটার বহুদূর পার থেকে কে যেন হাতছানি দিত।

তারপর সত্যি সত্যি কত ভাল জিনিষই পেলাম। গৌরী, সেই বনগাঁয়ের গাড়ীতে বসা, সেই বেলেঘাটা ব্রিজ ষ্টেশনে আমাদের প্রথম ও শেষ ঘরকন্না, সেই আয়না বার করে দেওয়া সেই চিঠি বুকে করে মাথায় কপালে ঠেকানোর কথা মনে হ'য়ে পুলক হয়।

তারপর চাটগাঁয়ের সুন্দর দিনগুলো—জানি! ফরিদপুরের সত্যবাবুদের বাড়ী? তারপর এক সুন্দর জীবনের period চললো। সেই নয় বৎসরের ক্ষুদ্র বালককে কি ভালই বাসি! তার সেই মামা জুতো মেরেছে বলে কান্না, সেই মক্কা-মদিনায় যাওয়া বালিশ, সেই "শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি"!

এ সব চলে যাবে জানি। আবার নূতন আসবে জীবনে। আরও কত-কত আসবে। এও ঠিক, একদিন সব বন্ধ হয়ে যাবে। একদিন স্নিগ্ধ অপরাহ্নে, বাবলা বনের ছায়ায়, ইছামতীর তীরের বনঝোপের বিহঙ্গ তানের মধ্যে, নীরব শান্তির কোলে এ জীবনের দেওয়া-নেওয়া সব শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু তাতে কি? মানুষ অনন্তের যাত্রী। তার পথ ঐ দূর ক্ষীণ নক্ষত্রের পাশ কাটিয়ে দূর কোন অনন্ত লোক অনন্ত কালের পথিক, যাত্রী সে—তার যাওয়া-আসা কি ফুরাবে হঠাৎ?

আমি এই যাওয়া-আসা স্বপ্নে ভোর হয়ে বড় আনন্দ পাই। আবার যে আসতে হবে তারপর, তাও আমি জানি! হয়ত একবার এসেছিলাম দূর কোন ঐতিহাসিক যুগে—হয়তো রোমের দ্রাক্ষালতার কুঞ্জের আড়ালে ভূমধ্যসাগরের নীলজলের তীরের কোন সম্ভ্রান্ত ধনীর প্রাসাদে। হয়তো প্রাচীন গ্রীসের গৌরবের দিনে গ্রীকবীর হয়ে জন্ম নিয়েছিলাম, আলেকজাণ্ডারের সৈন্যদলে ঢাল-তলোয়ার ধনুক নিয়ে যুদ্ধ করেছি—নয়তো কোন পাহাড়ের ছায়ায় বসে এইরকম স্বপ্ন দেখতাম—নয়তো ইংলণ্ডে কি ফ্রান্সে কোন অবজ্ঞাত গ্রামে কৃষকবালক হয়ে জন্মেছিলাম—এলম্ কি ওক্ গাছের নীচে বসে বসে ভেড়া চরাতাম—কে জানে?

আবার বহুদূরে জন্মান্তরে হয়তো ফিরতে হবে। পাঁচশো বছর পরের সূর্য্যের আলোক একদিন অসহায় অবোধ শিশু নয়নদুটি মেলবো। পাঁচশো বছর পরের পাখীর গান, ফুলবন, জ্যোৎস্না, আবার আমাকে অভ্যর্থনা করে নেবে। কোন অজানা দেশের অজানা পর্ণকুটীরে কোন অজ্ঞাত দেশের অজ্ঞাত ছায়াঝোপের তলে মাঠে বনে মুগ্ধ শৈশব কাটবে—অনাগত মা-বাপের স্নেহসুধায় মানুষ হব। পাঁচশো বছর পরের অনাগত কত বালকবালিকা তরুণ-তরুণী, কত সুখ-দুঃখ-আশা নিরাশা, লোকের সঙ্গে সে কত পুলক ভরা পরিচয়!

কেবলই মনে হয় সৃষ্টির যিনি দেবতা এত দয়া তাঁর কেন? এই অনন্তের সুধা-উৎস মানুষের জন্যে তিনি কতকাল থেকে খুলেছেন? এই অন্ধকারে তবু হাতজোড় করে তাঁকে ধন্যবাদ দিই।

॥ ১৮ই নভেম্বর, ১৯২৭ ॥

মানুষের সত্যিকার ইতিহাস কোথায় লেখা আছে? জগতের বড় বড় ঐতিহাসিকগণ যুদ্ধ-বিগ্রহের ঝঞ্ঝনায় সম্রাট্ সম্রাজ্ঞী সেনাপতি, মন্ত্রীদের সোনালী পোষাকের জাঁকজমকে দরিদ্র গৃহস্থের কথা ভুলে গিয়েছেন। পথের ধারে আম-গাছে তাদের পুঁটুলি-বাঁধা ছাতু কবে ফুরিয়ে গেল, কবে তার শিশুপুত্র প্রথম পাখী দেখে সানন্দে মুগ্ধ হয়ে ডাগর শিশুচোখে চেয়েছিল, সন্ধ্যায় ঘোড়ার হাট থেকে ঘোড়া কিনে এনে পল্লীর মধ্যবিত্ত ছেলে তার মায়ের মনে কোথায় ঢেউ বইয়ে-ছিল। দুহাজার বছরের ইতিহাসে যে সব কথা লেখা নেই—থাকলেও বড় কম। রাজা যযাতি কি সম্রাট মেণ্টুহোটেপ জুলিয়াস সীজর, থিয়োডোসিয়াম এবং তাবৎ সম্রাট্ পরিবারের শুধু রাজনৈতিক জীবনের গল্প আমরা শৈশব থেকে মুখস্থ করে

এসেছি। কিন্তু গ্রীসের রোমের যব ও গমের ক্ষেতের ধারে ওলিভ, বন্যদ্রাক্ষার ঝোপের ছায়ায় ছায়ায় যে দৈনন্দিন জীবন হাজার হাজার বছর ধরে সকাল-সন্ধ্যা যাপিত হয়েছে—তাদের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশার গল্প, তাদের বুকের স্পন্দনের ইতিহাস আমি জানতে চাই। হোমার ভার্জ্জিলের কবিতা প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠত কিনা এদের তুচ্ছ কথা আমি জানি না কিন্তু উত্তরপুরুষদের কৌতূহল, স্নেহ ও সম্মানের অধিকারী হ'ত তারা একথা ঠিক।

কেবল মাঝে মাঝে এখানে ওখানে ঐতিহাসিকদের পাতায় সম্মিলিত সৈন্যব্যূহের ফাঁকে সরে যায়, সারিবাঁধা বর্শার অরণ্যের ভিতর দিয়ে দূরের এক ভদ্র গৃহস্থের ছোট বাড়ী নজরে আসে, অজ্ঞাত কোন লেখকের জীবন কথা, কি কালের স্রোতে কূল-লাগা একটুকরা পত্র, প্রাচীন ইজিপ্টের কোন কৃষক শস্য কাটবার জন্য তার পুত্রকে কি আয়োজন করবার কথা বলে দিল—বহু হাজার বছর পর তাদের টুকরো ভাঙ্গা ফাটা মাটির তলায় চাপা-পড়া মৃন্ময় পাত্রের মত পুরাতত্ত্বের কৌতূহলী পাঠকের চোখে পড়ে। তারপর কল্পনা—আর কল্পনা!

প্রস্ফুট সর্ষে ক্ষেতের সুগন্ধের মধ্যে বসে প্রভাতের নীল আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে আবার সেই দূরকালের পূর্ব্বপুরুষদের কথা ভাবি।

বর্ত্তমানে একদল লেখক উঠছেন যাঁরা ইতিহাসের এই ফাঁক পূর্ণ করবেন; তাঁরা ছোট গল্প লেখক, উপন্যাসিক, জীবন-চরিত লেখকের মধ্যে যাঁরা খুব সূক্ষ্ম দ্রষ্টা তাঁরা—দৈনিক লিপি-লেখক—এঁদের দল। চেবাঙ, এচ. জি. ওয়েলস, গর্কি, ব্রেটহার্ট, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, শৈলজা মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র—এঁদের লেখা ভবিষ্যৎ যুগের পুস্তকাগারে দেশের ও জাতির সাময়িক ইতিহাসের তালিকার মধ্যে স্থান পাবে—খুব সূক্ষ্ম খাঁটি বিস্তৃত এবং অত্যন্ত পাকা দলিল হিসাবে এদের মূল্য হবে। রোমান্স লেখকগণও সম্পূর্ণ বাদ পড়ে যাবে না—তাঁদের কল্পনার উল্লাস, আবেগে অনেক সময় জীবনের সূক্ষ্ম দর্পণকে মাঝে মাঝে হারিয়ে ফেলেন বটে, কিন্তু তবুও স্কটের লেখা থেকে মধ্যযুগের ইউরোপের সম্বন্ধে যা জানতে পারি, কোন্ ঐতিহাসিক অতটা আলো সে সময়কার সমাজ, চিন্তাধারা, আচার-ব্যবহার, জীবনযাত্রা-প্রণালীর উপর ফেলতে পেরেছেন?

কিন্তু আরও সূক্ষ্ম আরও তুচ্ছ জিনিষের ইতিহাস চাই। আজকার তুচ্ছতা হাজার বছর পরের মহাসম্পদ। মানুষ মানুষের বুকের কথা শুনতে চায়। কোটী কোটী মানুষ প্রলয়স্রোতে ভাসছে, ভবিষ্যতের সত্যিকার ইতিহাস হবে এই

কাহিনী মানুষের মনের ইতিহাস, তার প্রাণের ইতিহাস। কাবুল যুদ্ধ কি করে জয় করা হয়েছিল, সে সবের চেয়েও খাটি ইতিহাস।

এই যুগ যুগব্যাপী বিশাল মানবজাতি—শুধু তাও নয়—এই বিশাল জীবজগৎ—কোন্ মহাঔপন্যাসিকের কলমের আগায় বেরুলো উপন্যাস। অধ্যায়ে অধ্যায়ে ভাগ করা আছে। মহাসমুদ্রগর্ভে বিলীন কোন্ বিস্মৃত যুগের আট্‌লান্টিক্ জাতির বিস্মৃত কাহিনীও যেমন এর কোনো অধ্যায়ের বিষয়ীভূত ঘটনা তেমনি আজ মাঠের ধারে বন্যশৃগালের নখদন্তে নিহত নিরীহ ছাগশিশুর মৃত্যুতে যে বিয়োগান্ত ঘটনার পরিসমাপ্তি হ'ল তাও এর এক অধ্যায়ের কথা। ঐ যে কচুঝাড় বাঁশবনের আওতায় শীর্ণ হয়ে হলদে হয়ে আসছে—ওর কথাও।

কিন্তু এ উপন্যাস মানুষের পাঠের জন্যে নয়। মানুষ শুধু মাটি পাথর খুঁড়ে, এতে ওতে জোড়া তালি দিয়ে, দস্যুবৃত্তি করে লুকিয়ে চুরিয়ে এর এক আধ অধ্যায় চাবি-আঁটা পেঁটরা থেকে দিনের আলোয় এনে পড়ছে—সব বুঝতেও পাচ্ছে না।

॥ ৩০শে নভেম্বর, ১৯২৭, ইস্‌মালিপুর ॥

সন্ধ্যার আগে লাখপতি মণ্ডলের টোলার পেছনের কুন্ডীটা পার হয়ে ঘোড়া কাশজঙ্গলের মধ্যে দিয়ে খুব ছুটিয়ে রামজোতের পুরোনো বাগান দিয়ে নীচের কুন্ডীটাতে গেলাম। লাখপতিদের টোলার মাথার উপরে রাঙা টকটকে লাল সূর্য্যটা অস্ত যাচ্ছে। শীতের সন্ধ্যায় কাশজঙ্গলের ধারে ধারে কেমন সোঁদা সোঁদা ঠাণ্ডা গন্ধ। কুন্ডীটার ধার দিয়ে খুব জোর করে ঘোড়া ছুটিয়ে কুন্ডী পার হয়ে সামনের সেই কুন্ডীটা যেটার ধারে সেদিন লাল হাঁস বসেছিল—আমি যেতে যেতেই উড়ে গেল,—মারতে পারিনি—সেই কুন্ডীটার ধারে গেলাম। পাখী কোথাও কিছু নেই। দূরপ্রসারী ঈষৎ অন্ধকার কাশজঙ্গলের মাথার উপর তাকিয়ে ভাবছিলাম—নয় বছর আগে ঠিক এমন দিনগুলোতে বারাকপুরের বাড়ীতে সেই হরিরায়ের বাড়ীতে বসা—হরিপদ দা—সেই শোকের দিনগুলো আজ কোথায় কি হয়ে গিয়েছে।

জঙ্গলের পাশ দিয়ে দেখলাম দুটি হাঁস জলে সাঁতার দিচ্ছে কিন্তু বন্দুকটা আনিনি। কতকগুলি Snipe-ও ছিল, এদেশে বলে চাহা—বন্দুক থাকলে সুবিধা হোত।

তারপর খুব জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে এলাম।

আজকাল ঠিক দুপুরে ও সন্ধ্যার আগে একবার করে বসি কাছারীর পেছনের কাশজঙ্গলের ধারে সর্ষেক্ষেতের পাশে। প্রস্ফুট সর্ষেফুলের গন্ধে সেই ছেলে-বেলার বড়দিনের বন্ধে বনগাঁ থেকে বাড়ী আসার কথা মনে পড়ে। বড় আনন্দ হয় এই মাটি, এই আধ-শুকনো, আধ-সবুজ কাশবনের স্নিগ্ধ ছায়া, তারই ধারে এই হলুদ রংএর গন্ধে ভরপুর সর্ষেখেত, এই নির্জ্জনতা একবারে মাটির মায়ের কোলে বসে থাকা। এই আকাশ—আমার জানলা দিয়ে রোজ সন্ধ্যায় দেখতে পাওয়া, দূর পুব আকাশের orion-এর pointer-টা বড় মুগ্ধ করে দেয় আমাকে। আকাশের নক্ষত্রের দিকে চেয়ে চেয়ে নির্জ্জন কাশবনের রহস্য আমার প্রাণে এসে লাগে—জীবনটা কি? কি গহন গভীর গোপনতা—কি যাওয়া আসার গতিচ্ছন্দ।

কাল সন্ধ্যায় টেবিলটায় বসে লিখতে লিখতে দূর পুব-আকাশের একটা নক্ষত্রের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবলাম—ঐ সব নক্ষত্রের বা তার পাশের গ্রহের অজানা জীবনযাত্রা, আমাদের কাছে একেবারে গোপনতায় ঢাকা। কে জানে ওর মধ্যে কি প্রাণীদল, কি জীবনের গতি। এই আমি যে অত্যন্ত বাস্তব জীব এই টেবিলে বসে লিখছি—আর ঐ জ্বল-জ্বলে তারাটার মধ্যে অনন্ত মহাশূন্যের ব্যবধান—কোনকালেই এ ব্যবধান পৃথিবীর জীবে ঘোচাতে পারবে না বোধ হয়। কে জানে ওদের জগতে কিরকম জীবনযাত্রা? গভীর রাত্রে রামচরিত যখন আমার ঘরে ঘুমিয়ে পড়ে তখন বাইরে উঠে নির্জ্জন বন মাঠের ওপরকার নক্ষত্রভরা আকাশের দিকে চেয়ে থাকি। বহু দূরপারের গভীর কোন্ গহন রহস্য ধীরে ধীরে আমার মনে নেমে আসে—সে বলা যায় না, লেখা যায় না। জীবনের গভীর মুহূর্ত্ত সে সব—কেবল তা মনে এই সত্য আনে যে জীবন ঐ দূর ছায়াপথের মত দূরবিসর্পিত, এটুকু শেষ নয়। এখানে আরম্ভও নয়—সুদূর কোথা থেকে এসে সুদূরের কোন্ পারের দিকে তার ডিঙ্গার মুখ ফিরানো।

প্রাণের মধ্যে এই অনুভূতিটুকু যেন সকলের সত্য হয়ে ওঠে।

॥ ২রা ডিসেম্বর, ১৯২৭ ॥

গভীর রাত্রে নির্জ্জন কাশবনের মধ্যের কাছারী ঘরে শুয়ে শুয়ে গিবন পড়ছিলাম। কত রাজা রাণী সম্রাট মন্ত্রী খোজা সেনাপতি, কত সুন্দরী তরুণী বালক যুবার আশানিরাশার দ্বন্দ্বের কাহিনী। কত যুদ্ধ-বিগ্রহ, উত্থান-পতন, কত অত্যাচার-উৎপীড়ন, হত্যা, পরের জন্য কত প্রাণ দেওয়া—অতীতের ছায়ামূর্ত্তিরা আবার

গিবনের পাতায় ফিরে এল। হাজার যুগ আগের কত অশ্রুনয়না নিষ্কলঙ্ক তরুণী, কত আশাভরা বুক নিয়ে কত মা-বাপ কোথায় সব চলে গিয়েছে! অনন্ত কাল-মহাসমুদ্রে কোন অতীতকালে ছায়া হয়ে মিলিয়ে গিয়েছে—কবে--কোথায়! এই গভীর রাত্রে তারা ফিরে এল।

পড়ছিলাম গিলডো, রুফাইলাস, খোজা ইউটোপিয়াসের অর্থলিপ্সার কথা অর্থের জন্য তারা কি না করেছিল। বিশ্বস্ত বন্ধুর গুপ্ত কথা প্রকাশ করে তাকে ঘাতকের কুঠারের মুখে দিতে দ্বিধা করেনি। নানা ষড়যন্ত্র, নানা বিশ্বাসঘাতকতা—কোথায় তাদের অর্থের সার্থকতা—কোথায় তাদের সে বৃথা শ্রমের পুরস্কার?

এই দেড় হাজার বছর পরে দাঁড়িয়ে এদের সে মূর্খতা দেখে আমি ইতিহাসের পাঠক—আমাকে করুণা প্রকাশ করবার জন্যেই কি রুফাইলাস কাউণ্ট জনকে অত করে নির্দ্দয়ভাবে উৎপীড়ন করেছিল! সে করুণা কাউণ্ট জনের জন্য নয়, উৎপীড়ক রুফাইলাস ও তার ধনলিপ্সার জন্যে। কারণ আমি জানি তার পরিণাম।

বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্যের ইতিহাস গিবন ভ্রমশূন্য লিখেছিলেন কি বিউরি ঠিক লিখেছিলেন—সে বিষয়ে আমি তত কৌতূহল দেখাচ্ছি না—আমি শুধু কৌতূহলাক্রান্ত এই মহাকালের মিছিলে। এই সম্রাট, সম্রাজ্ঞী, খোজা ভৃত্য সৈন্য সেনাপতি--তৃণের মত স্রোতের মুখে ভেসে যাওয়ার দিকটা আমায় মুগ্ধ করে।

দুহাজার বছর আগের সে সব মানুষের মত—তাদের ইতিহাস লেখকও ছায়া হয়ে গিয়েছেন। ইংলণ্ডের কোন প্রাচীন সমাধিক্ষেত্রে জীর্ণ তার সমাধি দীর্ঘ তৃণে আচ্ছন্ন হয়ে আছে জানিনা। আর একশত বছর পরে এই আমিও স্বপ্ন হয়ে যাবো।

সন্ধ্যায় শান্ত বাঁশবনে দেবদারু পাতার মাথায় রাঙা রোদে, বৈকালের ম্লান আলোয়, মাঠের ধারের কাশবনে, নদীর ধারে আমি কতদিন এই গতিচ্ছন্দের সত্যকে মনে মনে চিনেছি। এর স্বপ্ন আমাকে বড় মুগ্ধ করে।

হাজার যুগ আগের এই ঐতিহাসিক ছায়ামূর্ত্তিদের মত সব মিলিয়ে স্বপ্ন হয়ে যাবে। যা কিছু বর্ত্তমান, সব। এই অপূর্ব্ব গতিভঙ্গি, মহাকালের এই তাণ্ডবনৃত্য ছন্দ যুগ যুগ ধরে রাজা, মহারাজা, সাম্রাজ্য, কাহিনীকে উড়িয়ে ফেলে দিয়ে আপন মনে কোন বিশাল অন্তরের মৃদঙ্গের গম্ভীর বোলের সঙ্গে তাল রেখে চলছে—দিকে দিকে, যুগে যুগে, ইউট্রোপিয়াস্, গিল্ডো, রুফাইলাসের দল ও তাদের কড়ির পুঁটুলি ফেনার ফুলের কত মিলিয়ে যাচ্ছে—জাতি, মহাদেশ মথিত হয়ে যাচ্ছে

তাঁর বিরাট চরণ-পেষণে। মহাশূন্যে তাঁর মহাবিষাণ শুধু অনন্তকাল ধরে এই চলে যাওয়ার উদাস ভেরীধ্বনি বাজাচ্ছে···অনাহত শব্দের মত তা সাধারণ মানুষের শক্তির বাইরে।

সে ধ্বনি সম্রাজ্ঞী ইউডক্সিয়া শোনেন নি। শুনেছিলেন সাধু জন্ ক্রাইসোটিম্। তাই তুচ্ছ বিষয়লিপ্সা ফেলে দিয়ে দূর সিরিয় মরুভূমির নির্জ্জন পাহাড়ের মধ্যে লোকচক্ষুর অন্তরালে তিনি ধ্যানজীবন যাপন করতেন। সান্ধ্য সূর্য্যচ্ছটায় সিরিয় মরুভূমির বালুরাশিতে সাধু জন্ এই গতিলীলার স্বপ্ন দেখেছিলেন নিশ্চয়ই।

॥ রাত্রি বারোটা, ৬ই ডিসেম্বর, ১৯২৭, ইসমালিপুর ॥

সন্ধ্যার পর আমার নিজের ঘোড়াটায় চড়লাম। প্রথমে ঘোড়াটায় চড়ে বেরুতেই সেটা বড় বদমায়িসী সুরু করে দিল। রামজ্যোতের বাসায় চালের কাছে নিয়ে গিয়ে প্রায় ঠেসে ধরেছিল আর কি! বেগতিক বুঝে অন্য কোনদিকে না গিয়ে বাঙ্গালী ধাপের দিকে গেলাম। সেখানে কারা মাছ ধরছে। অনেক পাখী বসে আছে, কিন্তু কয়দিনই উপরি উপরি পাখী মারতে গিয়ে অকৃতকার্য্য, হওয়ার দরুণ শিকারে আর স্পৃহা নাই। বাংলা ধাপের ওপারের জঙ্গলের মাথায় সূর্য্য অস্ত গেল—দ্বিরায় সূর্য্যঅস্ত একটা দেখবার জিনিস—কি রাঙা টকটকে আগুন রংএর সোনা? সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে—জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়ে দিলবরের টোলা বাসবিরিদের বাসা পার হয়ে চললাম। বম্না মণ্ডলের টোলা যেতে যেতে বেশ জোৎস্না উঠলো। লোধাই টোলায় যখন গিয়েছি, তখন তারা আগুন পোয়াতে বসেছে। তারপরই নির্জ্জন জঙ্গলের মধ্যে ঘোড়া ঢোকালাম। ঘন জঙ্গলে ভাল করে জ্যোৎস্না ঢোকেনি খাটো খাটো বন ঝাউ-গাছগুলো শিশিরে ভিজে গিয়েছে। জঙ্গল ক্রমে ঘনতর হ'ল, পথ শেষ হয়ে এল। আগে আর বছর যেখানে রাঁইচি—আমার লুট হয়েছিল, সেইদিকে ঘোড়া নিয়ে চলা গেল। অবশ্য একটু একটু ভয় হয়েছিল। বনে শূয়র বাঘের ভয় খুব। কাল অনেক রাত্রে ফেউ ডাকছিল। ভয়কে জয় করার জন্যে জিদ্ করেই আরও ঘন নির্জ্জন বনে ঘোড়া ঢুকিয়ে দিলাম। পরে অনেকটা গিয়ে ঘোড়া ফিরিয়ে আনলাম। দূরে পূর্ব্বদিকে চেয়ে মনে হ'ল আমাদের বাড়ীর নির্জ্জন ভিটায় বাঁশবনের ফাঁক দিয়ে একটু একটু জোৎস্না পড়েছে—এই শীতকালে কবে দোলাই গায় দিয়ে শৈশবে পাটালি দিয়ে চালভাজা খাবার লোভে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে এসেছি। তারপর লোধাইটোলা ছেড়ে সোজা পথটায়

ঘোড়া ছুটলো। চতুর্দ্দশীর মাঠভরা ধপধপে জ্যোৎস্না, নির্জ্জন মেঠো পথ—হুহু করে ঘোড়া ছেড়ে একেবারে বাংলা মণ্ডলের টোলার কাছটায় এসে পড়লাম। মনে পড়লো ১৯১৮ সালের এই সময় এই দিনগুলোতে হরিপদদার সঙ্গে দাবা খেলে সকাল বিকাল কি করেই কাটাতাম। পাশের মাঠটায় অনেক লাল হাঁস (চক্রবাক্) কাল সন্ধ্যায় বসেছিল। রামচরিতের সঙ্গে মারতে এসেছিলাম, কিন্তু গুলি করতেই সব পালিয়ে গিয়েছিল। জ্যোৎস্নার মধ্যে দিয়ে শুধুই ঘোরা হ'ল। ইউনিভার্সিটী ইন্‌সটিচুটে সিল্কের চাদর ওড়ানো মেয়েলি কলকাতায় ছেলের সঙ্গে ও এই ইংরাজ explorer যুবকদের কি তফাৎ!

ঐ রকম হওয়া চাই—দুর্দ্ধর্ষ, দুঃসাহসিক ঘোড়সওয়ার। বনে জঙ্গলে মেরুপ্রদেশের তুষার ভূমিতে কাটিয়ে এসেছে—কতবার মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছে—ভয় নেই। অথচ স্রষ্টা—out of chaos he has created something, ভগবানের তেজ, যৌবনদীপ্তি, জ্ঞান। অথচ কলকাতায় যখন ক্লাবে গিয়ে বসবে তখন সৌখীন খুব। সেও সিল্কের চাদর ওড়াবে, বেয়ারার হাতে কোকো বা কফি খাবে!

আজ সতীশের পত্র পেয়েছি বহুদিন পরে। সে দরজীর কাজ শিখতে কোন্ স্কুলে পড়ছে—কিছু সাহায্য চায়। কতকালের কথা—সেই জাঙ্গিপাড়া—সেই ঠিক এই সময়ে জাঙ্গিপাড়া রেলষ্টেশনের মধ্যে রাখাল বাবুর সঙ্গে বসে গল্প করা, সেই ত্রিপুরা বাবু, বুড়ো চক্কবর্ত্তি মশায় চাল কড়াই ভেজে আনতেন—সতীশ দুধ জাল দিয়ে নিয়ে আসতো, আর রুটী করে নিয়ে আসতো। সেই একদিনের ছুটী কোথাও না গিয়ে জাঙ্গিপাড়াতেই কাটানো গেল। লাইনের ধারে চেয়ারে বসে তেল মাখলাম—সে এক জীবন কেটেছে।

মনের কোথায় যেন অদৃশ্য খোপে গত জীবনের স্মৃতি সব ঠাসা আছে,—পিয়ানোর চাবিতে হাতপড়ার মত দৈবাৎ কোন্ পুরোনো খোপে হাত পড়ে যায়—হঠাৎ সেটা বড় পরিচিত সুরে বেজে উঠে—অনেক কালের আগের একটা দিন অল্পক্ষণের জন্য বর্ণে গন্ধে রূপে রসে আবার ফিরে আসে। এই রকম এল কাল—হঠাৎ অনেককাল আগে রংপুর থেকে ফিরে আসার পথে রাণাঘাট এসে অমৃতকাকার সঙ্গে যে রাণাঘাট Exhibition দেখতে গিয়েছিলাম খামাকো সেই সেইদিনটার কথাই মনে পড়ে গেল! সেই "সাজাহান" থিয়েটার হবে অত্যন্ত জাকজমকের সঙ্গে তার বিজ্ঞাপন—সেই চানাচুর ভাজা কিনে খাওয়া—সেই বাবার পাতানো মায়ের বাড়ী যাওয়া—স্পষ্ট ভাবে সব কথা মনে এল।

আজ আর একটা আজগুবি কথা মনে এল। হঠাৎ কলকাতায় গিয়ে প্রসন্নদের বাড়ীটা কি মদন মোহন ঠাকুরের বাড়ীর সামনে সেই শৈশবের মাঠগুদামটা ভাড়া নিয়ে বাস করা যায়? করবো নাকি? পঁচিশ বছর পরে আবার যদি সেই পঁচিশ বছর আগের দিনগুলো ফিরে আসে তবে তো!

॥ ৭ই ডিসেম্বর, ১৯২৭।

কাল রাত্রে সর্ব্বগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ ছিল। অনেক রাত পর্য্যন্ত আমি, গোষ্ঠবাবু দূরবীন দিয়ে চাঁদ দেখলাম। খুব যখন অন্ধকার হয়ে গেল তখন গিয়ে শুয়ে পড়ি। আজ সকালে উঠে প্রথমে জিনিসপত্র রওনা করে দিলাম। পরে খাওয়ার পরে ঘোড়া করে রওনা হলাম, মিত্র সঙ্গে সঙ্গে এল। লোধা মণ্ডলের টোলা ছাড়িয়ে এসে কাদা ততটা নেই, সেদিন অনাদি বাবুর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার দিন যতটা ছিল—পরে এসে পরশুরামপুর ঘাটে পৌছুনো গেল। কাছারীটা চিনতাম না—অড়হরের ক্ষেত বেয়ে বেয়ে এসে কাছারী পৌছান গেল। গত বৎসর মোহিনীবাবু ধামশ্রেণী গিয়েছিলেন—সেই ধামশ্রেণী! শৈশবের কত স্মৃতি মাখানো! জিজ্ঞাসা করলাম, রাণী সত্যবতীর ঠাকুরবাড়ীতে আজকাল রাত্রে সে রকম ভোগ হয় কিনা—সেই মজাপুকুরটা আছে কিনা। যেখান থেকে ঘোড়া ছেড়ে কারু মণ্ডলকে সঙ্গে নিয়ে আসতে আসতে কলবলিয়ার ধারের পথ বেয়ে দেখি বনোয়ারী পাটোয়ারী আজমাবাদ চলেছে। তারই হাতে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর বড় খাম খানা দিয়ে দিলাম। কলবলিয়ার পথ বেয়ে বেয়ে কখনো জোরে, কখনো আস্তে ঘোড়া ছুটিয়ে ভগবানদাস টোলার মধ্যে এলাম। পাছে পথভুলে যাই, এইজন্য সব সময়ে ডান দিকে বটেশ্বর নাথের পাহাড়টার দিকে নজর রাখছিলাম। সে টোলা ছাড়িয়ে সোজা কলবলিয়ার ধারে ধারে ঘোড়া ছুটিয়ে এলাম। কলাই ক্ষেতে ক্ষেতে তিনটাঁড়ার প্রজারা কলাই তুলছে। একটা বাবলা বন পেরিয়ে একটা সুন্দর পথে এলাম। বামদিকে পথের ছায়াঝোপ, কি সব ফুল ফুটে আছে, বেশ ছায়া পড়েছে—সেইদিকটা কিছুক্ষণ ধীরে ধীরে ঘোড়া করে এলাম, পরেই আবার একটা উলুখড়ের মাঠের ভেতর দিয়ে ঘোড়া খুব জোরে ছুটিয়ে দিয়ে সামনে দেখি কুতরুটোলা। তারপরেই পরিচিত সহদেব সিংএর বাসা দিয়ে লছমন মণ্ডলের টোলার অড়হর ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে সোজা চলে এলাম কাছারী। পথে পথে উৎসব বেশে সজ্জিতা নরনারী চন্দ্রগ্রহণের মেলা দেখে গল্প গুজব করতে করতে কোশকীপুর অঞ্চলে ফিরে যাচ্ছে। এ যেন

বহুদূর থেকে অজানা পথ বেয়ে মোটরে কি এরোপ্লেনে করে নিজে পথ চিনে চিনে কখনো ধীরে কখনো জোরে এঞ্জিন চালিয়ে চলে এলাম—পথে পাহাড়, নদী, অজানা বনজঙ্গল, বেশ লাগল আজকার দিনটায়।

সন্ধ্যার সময় বসে আরাম চেয়ারটার ঠেস্ দিয়ে অনেক কথা ভাবছিলাম। এই চেয়ারটা যেদিন থেকে তৈরী হয়েছে—ভ্রমণ সুরু হয়েছে সেদিন থেকে। সেই সত্যবাবুর বাড়ীর দেউড়িতে সন্ধ্যার সময় গিয়ে চেয়ারটা নিয়ে নামলাম—সেই ঢোকে ঢোকে জল খেয়ে তৃপ্ত হলাম—পরদিন থেকে যাত্রা সুরু হ'ল। মহারাণী স্বর্ণময়ী রোড, ৪৫ মজাপুর ষ্ট্রীট। সেই ফরিদপুরে সত্যবাবুর বাড়ী গোয়ালনন্দর ষ্টীমারে, মাদারিপুর, বরিশালে অনাদি বাবুর বাড়ী, চাটগাঁয়ের ষ্টীমার, কক্সবাজারের ষ্টীমারের ডেকে, সীতাকুণ্ডে, নরসিংদিতে জ্যোতির্ময়ের ওখানে ঢাকায়—আবার ৯৫, মিৰ্জাপুর ষ্ট্রীটে; বড় বাসায়, ইসমালিপুরে,—কত জায়গায়। এই তো সেদিন কানিবেনের জঙ্গল হয়ে, জামদহ, জয়পুরের ডাকবাংলায় শালবনের মধ্যে নির্জ্জন রাত্রি যাপন করে গেলাম দেওঘর। তারপর এই গেলাম রামচন্দ্রপুরে, বেণীবনে, বক্রতোয়ার ধারে ধারে, লক্ গেটে সূর্য্যাস্তের সময় কত বেড়ালাম। এই তো গেলাম পাটনা—শোণপুরে মেলা দেখলাম। জোৎস্নারাত্রিতে প্যালেজাঘাটে ষ্টীমারে বসে চা খেতে খেতে গঙ্গা পার হয়ে পাটনায় বৈকুণ্ঠবাবুর ওখানে ফিরে এলাম। হাসান ইমামের যে নতুন বাড়ীটা উঠছে তারই কাছে জ্যোৎস্নায় দাঁড়িয়ে দাড়িয়ে সেই কথা ভাবা, তারপর সেই কালীর সঙ্গে নালন্দা, সেই রাজগির যাওয়া, সেই বাঁশের বন, শোন ভাণ্ডার, সেই চেনো, হরনোং, শো—অদ্ভুত নামের ষ্টেশন সব—সেই গড়িয়ার জলার জ্যোৎস্না দেখতে দেখতে সাড়ে আটটার গাড়ীতে রাজপুর ঘোরা—সেই জাঙ্গিপাড়াকে ভাবতাম কতদূরের দেশটা! কতদিন পরে আজ মনে হ'ল সেই তারামোনের পুরানো বাড়ীটার কাছ দিয়ে পথ বেয়ে কাদের বাড়ী গিয়েছিলাম—সেই কলকাতায় হাবড়ার পুলের কাছে অন্ধ ভিখারিনীকে রাত্রিতে জিজ্ঞাসা করা—

এই অনবরত ভ্রাম্যমান জীবন। ঘুরতে হবেই যে—পথে সে নেমেছি—এই যে এখন তহশীলদার খবর দিলে রংবার লোকে লালকিশন সিংকে মেরেছে—এদেশের এই এখন খোনকার—আমাদের গ্রামের হয়ত এইরকম খোনকার আছে—হাড়িডাঙ্গায় কি বৰ্দ্ধনবেড়েতে ডাকাতি হয়েছে—যাই হোক আমি পথে নেমেছি। আমি কিছুর মধ্যে নই, অথচ সবের মধ্যেই আছি—জগতের এই অপূর্ব্ব গতির রূপ আমার চোখে পড়েছে। আমি আজন্ম পথিক—পথে,

বেরিয়েছি সত্যবাবুর বাড়ীতে যে দিন থেকে নেই—অনেক কাল আগে সেই ১৯০৮ সালে, এক সন্ধ্যায় বেহারী ঘোষের বাড়ী মাণিকের গান হ'ল—পরদিন জিনিষপত্র নিয়ে সেই যে বোর্ডিংএ এলাম—কি ক্ষণে বাড়ীর বাইরে পা দিয়েছিলাম জামি না—সেই বিদেশ বাস সুরু হ'ল। পরে আর বারাকপুরকে বারমাসের জন্য একবারও পাইনি—হারিয়ে হারিয়ে পেয়ে আসছি—কত জগদ্ধাত্রী পূজার ছুটীতে, গুডফ্রাইডের ছুটীতে, বড়দিনে, পূজায়—শনিবার পেয়ে এসেছি ছেলেবেলায়—এখনও অন্য ভাবে পাই।

এখনও তো শৈশবের স্বপ্ন দেখা সে সব দেশ দেখতে বাকী আছে, পথে যখন বেরিয়ে পড়েছি তখন সত্যই কি সে সব বাদ থেকে যাবে?

॥ ৯ই ডিসেম্বর ১৯২৭ ॥

আজও কালকার ঘোড়া চড়াটা ভাল লাগল। আজ একটু বেলা গেলেই বেরুলাম। লাল কিশন সিংএর বাসার পথটা দিয়ে, কলোয়ার চক হাটের পথ দিয়ে যখন যাচ্ছি তখন সূর্য্য ডুবু ডুবু। যেতে হবে বটেশ্বর নাথ পাহাড়ের এপার। খুব জোরে সুখটিয়া কুলবনের ভিতর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলাম। ঘোড়ার এই চলাটা আজকাল বড় আরামের মনে হয়। সহদেব সিংএর টোলার কাছাকাছি সেই বনঝোপভরা পথটায় অন্যদিন থামি, কিন্তু আজ বেলা যাওয়াতে আর না থেমে সোজা বেরিয়ে গেলাম। কুঁতরুটোলার মধ্যে মেয়েরা ইঁদারার জল নিতে আসছে, সেই জন্যে আস্তে আস্তে চালিয়ে বাইরের মাঠটায় পড়ে আবার জোরে ছুটলাম। কল্লুটোলার সামনে দিয়ে কলাইক্ষেতগুলোর পাশ দিয়ে এসে একটা উঁচু আল পার হলাম—সে জায়গাটি বড় নির্জ্জন, একটা ছোট অশ্বত্থ গাছ, বনঝোপ, সন্ধ্যার ঘন ছায়া ও নির্জ্জনতা বড় ভাল লাগল। পরেই এসে গঙ্গার ধারে প্রায়ান্ধকার পাহাড়টার দিকে চোক রেখে দূরে চিকচক্রবালের ধূসর সান্ধ্য মায়ায় মুগ্ধ হয়ে ঘোড়ার ওপর বসে রইলাম। সেই দিনটার কথা মনে পড়ে—সেই জ্যেঠামহাশয়ের সঙ্গে কুঠীর মাঠে গিয়ে ফিরে এসে ভেবেছিলাম কত দূর না গেছি! সেই দিনটি থেকে আজ কত দূর কোথায় চলে এসেছি! মায়ের কথা মনে হ'ল—ঠিক এই সময় মা বলতেন, আমায় শীগগির যেতে হবে, ছেলের আবার বিয়ে দোব।

কি অপূর্ব্ব এই জীবন! এই দুঃখের, আনন্দের, শোকের, স্নেহের, আশার, পুলকের ভালবাসার স্মৃতি জড়ানো— এই অপূর্ব্ব গতিশীল সুখদুঃখে মধুর এই

সুন্দর জীবন দোলা! ধূসর পাহাড়টার ওপরকার সন্ধ্যায় অন্ধকার-ঘেরা বনরাজির মাথার দিকে চেয়ে চেয়ে এর অপূর্ব্বতা অনুভ করে গা যেন শিউরে উঠল—চোখে জল এল। তারপর কতক্ষণ আপন মনে ঘোড়ার উপর বসে রইলাম। সন্ধ্যা যখন বেশ হয়ে গিয়েছে তখন আবার ঝন্নুদাম টোলা দিয়েই অন্ধকার মাঠের বনঝোপের পথ বেয়ে অড়হর ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে এসে লছমন মণ্ডলের টোলায় পৌছানো গেল।

তাই এই মাত্র অন্ধকারে কাছারীর পথটায় বেড়াতে মনে মনে ভাবছিলাম, ভগবান আমি তোমার অন্য স্বর্গ চাই না—তোমার দৈবলোক পিতৃলোক বিষ্ণুলোক—তোমার বিশাল অনন্ত নক্ষত্র জগৎ তুমি পুণ্যাত্মা মহাপুরুষদের জন্যে রেখে দিও। যুগে যুগে তুমি এই মাটীর পৃথিবীতে আমাকে নিয়ে এস, এই ফুল ফল, এই শোকাদুঃখের স্মৃতি, এই মুগ্ধ শৈশবের মায়াজগতের মধ্যে দিয়ে বার বার যেন আসা-যাওয়ার পথ তোমার আশীর্ব্বাদে অক্ষয় হয়। এই অমূল্য দানের কৃতজ্ঞতার বোঝাই বইতে পারি না—এর চেয়ে আর কোন্ বড় দান চাইবার সাহস করবো? বড় ভালবাসি এই মাটীর জীবনকে—এরই মাধুর্য্য যে লোভী বালকের মত বার বার আস্বাদ করে সাধ মিটাতে পারি না, একে এত সহজ ছেড়ে দিতে পারি কি করে?

॥ ১১ই ডিসেম্বর ১৯২৭ ॥

ইংরাজী নববর্ষের প্রথম দিনটা। কত কথাই মনে হয়, দেখতে দেখতে হুহু করে অগ্রসর হচ্ছে—এই সে দিন ১৯২৩ সালের এসময় ওদের ওখানে পড়াতে গেলাম—দেখতে দেখতে সে আজ পাঁচ বছর।

কাল সকালে ইস্মালিপুর থেকে খুব ভোরে বেরিয়ে হাতীর ওপর করে নবীন বাবু ও অমরবাবু বার হয়ে ভাগলপুর গেলাম। সন্ধ্যার ট্রেণে অমরবাবুকে রওনা করে এসেই উদয়বাবু ও বেচুবাবুকে সঙ্গে নিয়ে সুরেনের ওখানে গান শুনতে গেলাম। বড় ভাল লাগে সুরেন বাবুর গান আমার কাছে—এমন শুদ্ধ প্রাচীন সুর আমি কোথাও শুনিনি—যে সব পর্দ্দায় সাধারণের কণ্ঠ নামে না, তাদের ওপর সুরেন বাবুর অপূর্ব্ব দখল—সুর-লক্ষ্মীর সকল রকম মান অভিমানের খোঁজ তিনি রাখেন।

আজ সকালে উদয় বাবু স্টেশনে উঠিয়ে দিয়ে গেল। সত্যবাবুর ছেলে ভাতুর সঙ্গে এক সঙ্গে এলাম—ভারী সুন্দর দেখতে, বাবার মত একটু বাজে বকে,

একটু হামবড়া ভাব। ক'দিন বড় হৈ চৈ গেছে—আমি ওসব ভালবাসি। জগতের পেছনের যে নির্জ্জন জগৎটা আছে, তা শুধু শান্ত সন্ধ্যায়, স্নিগ্ধ বনের লতাপাতার সুরভিতে আমার কাছে ধরা দেয়—গভীর রাত্রের জ্যোৎস্নায় আসে। এটর্ণি অফিসের ব্রিফসঙ্কুল কল-কোলাহল কর্ম্মমুখর জীবন আমার বিষের মত ঠেকে। তাই আজ শান্ত বৈশালে যখন কলবলিয়া নদীতে নৌকা পার হচ্ছিলাম, তখন বড ভাল লাগল। এই আকাশ, এই বৈকাল, এই শ্যামল শান্তি, এই অপূর্ব্ব উদার জগৎ—সন্ধ্যা, জ্যোৎস্না আমার জীবনে এরাই অক্ষয় হয়ে থাকুক। চাই না তোমাদের দশ হাজার টাকার চেক্, মিনার্ভা মটরগাড়ী, পেলিটীর বাড়ীর খানা, অমুক এটর্ণির অত আয়ের বিষয় সম্পত্তি। তোমাদের মর্টগেজ ট্রান্সফার প্রপার্টিজ এ্যাক্ট, কোবলা, ওয়ার বণ্ড তোমাদের থাকুক—এই নিঃসীম নীলশূন্য, ওই তারকারাজি শেষ রাত্রির জ্যোৎস্নায় নাগকেশর ফলের সুরভি, কতদিন-হারা ছেলেমেয়েদের অস্পষ্টপ্রায় মুখগুলো আমার আপনার হয়ে থাকুক।

বেশ মনে আছে, বহুকাল আগের শৈশবে, সেই শিউলিফুলের তলায় ওদিককার ঘাসবনে যখন চড়াই পাখী, দয়েল পাখী বসতো, এই শীতের দিনে প্রথম প্রভাতের রাঙা রোদ্রে পিঠ পেতে বসে মায়ের হাতের পিঠে খেতে যে অপূর্ব্ব কল্পনা জগতের স্বপ্ন দেখেছি—আমার বাঁশবনের ভিটার প্রতি ধূলিকণায় তার লিখন আছে—কোন্ এটর্ণি আফিসের মর্টগেজ দলিল দস্তাবেজের মধ্যে তার জুড়ি খুঁজে মিলবে? সেই "নন্দসুত নীল নলিনাও" গান, সেই বালক কীর্ত্তন, সেই বকুলতলা, নটকান গাছ, ঝিল্‌বিলে, মুখো পূব-যাওয়া ভারত—সেই অদ্ভুত শৈশবস্বপ্ন—আমার সে সবই চিরদিনের সম্পদ হয়ে থাকুক।

আর সম্পদ হয়ে থাকুক, এমার্সন শেলি চেকভ রবীন্দ্রনাথ, আমার ঐ ছেঁড়া কলিদাস খানা, রামায়ণ বার্ণার্ডশ—এদেরই আমি চাই, এরাই আমার ঐশ্বর্য্য।

আজ আবার শান্ত গ্রামাজীবনের মধ্যে এসে পড়েছি। আবার প্রশান্ত জীবন, সুন্দর নাক্ষত্রিক শূন্য, সন্ধ্যার বিচিত্র কর্ণকদম্ব, বলোয়া এসে গল্প করছে, বলছে—ম্যানেজার বাবু, তুমি যখন আসছিলে তখন আমি কুলোকুমারের কলাই-ক্ষেতে বসেছিলাম, তার পর ভাই কডুরিয়া এসেছে, আনন্দিয়া এসেছে—এই সব গল্প করছে।

আজ নব বর্ষের প্রথম দিনটা যেমন শান্তিতে কাটল—সারা বছরটা এই রকম কাটুক।

॥ ১লা জানুয়ারী, ১৯২৮ ॥

আবার সে শান্ত জীবন আরম্ভ হয়েছে। কাল ও আজ আবার আজমাবাদের কুলবন দিয়ে পাকা কুল খেতে ঘোড়া ছুটিয়ে, সহদেব টোলার সেই তেলাকুচা ঝোপবনের ভেতর দিয়ে অস্তসূর্য্যের আলোয় ধীরে ধীরে গিয়ে কুতরুতোলা দিয়ে গঙ্গার ধারের দূরের পাহাড়গুলোর ধূসর দৃশ্য দেখতে দেখতে গঙ্গার ধারে গিয়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানটাতে ঘোড়া দাঁড় করালাম। সন্ধ্যায় ধূসর আকার নদীজল পাহাড়, বহুদূরের দিক্‌চক্রবাল কোন মায়াজগতের ইন্দ্রজালময় স্বপ্নছবির মত অপরূপ দেখাচ্ছে। আবার সেই মাথার উপরে প্রায়ান্ধকার আকাশের প্রথম নক্ষত্রটি লক্ষ আলোকবর্ষ দূরের জগতের অজানা কুহক নিয়ে আমার দিকে চেয়ে আছে—শৈশবের বাঁশবনের গভীর রাত্রে লক্ষ্মীপেঁচার ডাকের মত গভীর রহস্যভরা জীবনকে আবার ফিরে পেলাম।

সন্ধ্যা হয়ে গেলে বাংলা গাছে পাশের সরু খালের পথ দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিই, ক্ষেতে ক্ষেতে লোক গান গাচ্ছে, কলাইএর বোঝা মাথায় করে ক্ষেত থেকে ফিরছে—ভীমদাস টোলার ঘরের উঠানে কলাইএর ভূষায় আগুন করে গোল হয়ে লোকে বসে আগুন পোহাচ্ছে আর গল্প করছে, ঝল্লুটোলার ইঁদারায় মেয়েরা জল তুলছে—দেখতে দেখতে বাইরের মাঠে পড়ি. একটু একটু জ্যোৎস্না ওঠে. হু হু পশ্চিমে বাতাসে কন্‌কনে শীত করে। বাঁধটার ওপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়ে ডানদিকের অস্পষ্ট দিকচক্রবালের দিকে চেয়ে চেয়ে দেশের কথা ভাবি—ঠাকুরমা, পিসীমা, বড চারা আমগাছ তলায়. নদীর ঘাটে কি করে আনন্দ ভোগ করে গিয়েছেন গত পুরুষের সে কথা ভাবি—জ্যোৎস্নায পথের পাশেব আকন্দগাছ চক চক করে, ধুতুরার ফুল সুন্দর দেখায়—কাছারী এসে পৌছাই।

॥ ৩রা জানুয়ারী, ১৯২৮॥

একটু বেশী বেলা থাকতে আজ বেরিয়ে সুখটিয়ার কুলবনে এগাছে ওগাছে কুল খেতে খেতে বন ঝোপ অস্তমান সূর্য্য আকাশে চতুর্দ্দশীর চাঁদ. ঘুঘু-মিথুন, সবুজ গমক্ষেত দেখতে দেখতে গিয়ে গঙ্গার ধারে গেলাম। চতুর্দ্দশীর চাঁদের আলো গঙ্গার জলে অল্প অল্প পড়ে চিক্ চিক্ করছে—ওপারের কুয়াশাচ্ছন্ন তীরভূমি দেখে হঠাৎ মনে হ'ল—আমি সুনীল ভূমধ্য সাগরের তীরে দাঁড়িয়ে দূরের কোনো দ্বীপের দিকে চেয়ে আছি—হাজার দুহাজার বছরকার আগেকার জীবনযাত্রা আবার যেন চোখে পড়ে—কত সম্রাট সম্রাজ্ঞী সেনাপতি মন্ত্রীর দল—থেস্‌দেশীয় সামান্য গৃহস্থঘরের শান্ত সহজ জীবনযাত্রা, কত এল্‌ম, ওক্, মার্টল্ গাছের ছায়া,

বন্য আঙুরলতার ঝোপঝাপ, জুনিপার গাছের বন—হাজার বছর আগের যে লোকদল, তাদের সভ্যতা, গর্ব্ব, সোনা রূপার রথ নিয়ে ঐ অস্পষ্ট কুয়াশাচ্ছন্ন দূর তীরভূমির মতই ছায়া হয়ে হাজার বছর আগে কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে। অনন্ত জীবন কেবল এই নীল জলধিরাশির পথ অনন্ত পানে চেয়ে চলেছে একটানা—বড় বড় সাম্রাজ্যের কঙ্কাল, তীরস্থ শেওলা, জলজ উদ্ভিদের মত একপাশে হেলায় ফেলে রেখে দিয়ে উদাসীর মত চলেছে। আবার এখন থেকে থেকে হাজার বছর কেটে যাবে—সে দূর ভবিষ্যতের নবোদিত প্রভাতে সে যুগের তরুণ বংশধরদের কাছে আমাদের জ্ঞান বিজ্ঞান, মোটর এরোপ্লেন, বেতার যন্ত্র, ট্যাঙ্ক প্রভৃতি নিতান্ত আদিম যুগের পণ্য বলে বিঘোষিত হবে—প্রাচীন রোমানদের স্বর্ণরৌপ্যে জাঁকজমকওয়ালা স্প্রিংবিহীন গাড়ীর মত।

মানুষকে শুধু চলতে হবে। চলাই তার ধর্ম্ম—পথের নেশা তোমাকে আশ্রয় করুক। যুগে যুগে তোমাকে আসতে যেতে হবে—নব নব প্রভাতে নব নব ফুল-ফল, হাসিমুখ তরুণ শৈশব স্নেহ প্রেম আশা হাসি জ্যোৎস্না—পথের বাঁকে বাঁকে ডালি সাজিয়ে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে—অনন্ত জীবনপথে কতবার তুমি তাদের পাবে আবার পেছনে ফেলে চলে যাবে—আবার পাবে।

চরণ বৈ মধু বিন্দতি। চরণ স্বাদুমুদ্ভূ স্বয়ম—এই চলার বেগের অমৃত তোমার আপনার জীবনে সত্য হোক।

জীবনে অনন্তকে চিনতে হবে, নতুবা আত্মার দৈন্য ঘোচাতে পারবে না। গতির মধ্যে দিয়ে অনন্তের স্বরূপ চোখে ধরা দেবে। হে জীবন পথের পথিক, পথের ধারে ঘুমিয়ে প'ড়ো না।

॥ ৬ই জানুয়ারী, ১৯২৮ ॥

আজ পূর্ণিমার দিনটা পূর্ণচন্দ্রকে ভাল করে উপভোগ করবার জন্যেই একটু দেরী করে বেড়াতে বেরুলাম। সুখটিয়া কুলবনেই বেলা গেল। সহদেবটোলায় তেলাকুচা ঝোপে ভরা সেই পথটায় যখন গেলাম তখন সূর্য্যের রাঙা রোদ ঝোপঝাপের গায়ে পড়েছে। আস্তে আস্তে ঘোড়া চালিয়ে আসছিলাম, প্রতি আকন্দ গাছ, তেলাকুচা লতা, নাটাকাঁটার ঝোপ, ছায়াশ্যামল তৃণভূমি উপভোগ করতে করতে মুখে দোদুলামান আলোকলতার স্পর্শ মেখে, পিছনের মাঠে অস্তসূর্য্যের রক্তগোলকটা পিঠের ওপর দিয়ে চেয়ে চেয়ে দেখতে দেখতে [illegible]টোলায় এসে পৌছলাম। তারপর পাখীর কাকলি শুনতে শুনতে ডাইনের

শ্যামল শস্য-ক্ষেত্র, একটু দূরেই সন্ধ্যার কুয়াশায় অস্পষ্ট গঙ্গা ও ওপারে পাহাড়টা দেখতে দেখতে গঙ্গার ধারে এলাম। পূর্ণচন্দ্র ততক্ষণ উঠে গিয়েছে—গঙ্গার জলে দীর্ঘ রশ্মি পড়ে কাঁপছে। দিয়ারা থেকে মাথায় করে লোকে কলাইএর বোঝা নিয়ে ফিরছে—মাঠে খুপড়ী থেকে কলাইএর ভূষার সাঁজাল দিয়েছে—তারই ধোঁয়ার গন্ধ বেরুচ্ছে।

জীবনটা কি অপূর্ব্ব, শুধু তাই আমার মনে পড়ে। সেই কতদিন আগে—মনে পড়ল এমন দিনটিতে বাবার সঙ্গে গিয়েছিলাম আড়ংঘাটার ঠাকুর বাড়ীতে। সেই ছোট্ট ঘরটাতে থাকতাম, মোহন্ত ভোরবেলা উঠে কি স্তোত্র পাঠ করত, আর পিতলের লোটায় ঝোল রেঁধে আমাদের খেতে দিত। সেই তেঁতুলতলার দিকে বেড়াতে যাওয়া—সেই ওপরের ছাদে বসে সংস্কৃত ব্যাকরণ ও ভিক্টর হিউগোর লা মিজারেবল পড়া—স্বপ্নের মত মনে আসে। এই আজকার পূর্ণিমায় সেই আড়ংঘাটার ছাদটা কি রকম দেখাচ্ছে? বাবার করুণ-স্মৃতিমাখা আড়ংঘাটার কথা কি কখনো ভুলবো? ওপারের ধূসর পাহাড় শ্রেণী, কুয়াশাচ্ছন্ন উদাস গঙ্গাবক্ষ, সুদূর পূর্ব্ব দিক্‌চক্রবাল···এদের সামনে রেখে কেবলই মনে পড়ে আমার দেশের ভিটায় এমনি জ্যোস্না আজ উঠেছে– চাঁপা পুকুরের পুকুর ঘাটে, বেলেঘাটা ব্রিজের মাঠে, ইচ্ছামতীরধারে, চাটগাঁয়ের মণিদের বাড়ী পুরোনো স্মৃতির সব জায়গাগুলোতে। কুটির মাঠের কথা হঠাৎ মনে পড়ে—দেশের জন্যে মন কেমন করে। তারপর পূর্ণচন্দ্রকে পেছনে রেখে ঘোড়া ছেড়ে দিলাম। চারধারের মাঠ কুয়াশায় ঘিরে নিয়েছে, সারাদিনের পশ্চিমে বাতাসের পর এত ঠাণ্ডা পড়েছে যে হাতে দস্তানা পরেও আঙ্গুল কন্‌কন্ করছে—ভীমদাস-টোলায় ঘরে ঘরে লোকে কলাই-ভূষায় 'ঘুর' লাগিয়ে আগুন তাতছে—ইন্দারায় মেয়েরা জল তুলছে। গত বর্ষাকালে যে খালটা দিয়ে নৌকা বেয়ে ভগু সিংএর বাড়ীর পিছনের ঘাট দিয়ে বেড়াতে এসেছিলাম সে খালটার জল এখন শুকিয়ে গিয়েছে। বালির ওপর দিয়ে ঘোড়া চালিয়ে এলাম। বাঁধের ওপরে উঠে আবার আড়ংঘাটার কথা মনে এল। বাঁধ ছাড়িয়েই একদৌড়ে ঘোড়া ছুটিয়ে একেবারে ঘোড়া নিয়ে এলাম রাসবিহারী সিংএর টোলার অশথ গাছটার কাছ পর্য্যন্ত। এত জোরে এলাম যে পরমেশ্বরী কুমারের যে খুবড়ীতে লোকজন আগুন তাপছিল—তারা হাঁ করে চেয়ে রইল।

। ৭ই জানুয়ারী, ১৯২৮ ॥

আজ নতুন পথে গেলাম। সীমানায় চলে গিয়ে অযোধ্যা সিংএর বাড়ীর কাছের পথ ধরে মহারাজির জঙ্গলের পাশের পথ দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলাম। আজকার মত একদৌড়ে অতটা পথ কোনো দিন ঘোড়া যায় নি। ফাঁকা মাঠ, দুপাশে ঘন কাশের ও নল খাগড়ার বন পার হয়ে বড় বাবলা বনটার পাশ দিয়ে সোজা উত্তর-পূর্ব্ব কোণে ঘোড়া ছাড়লাম। বটেশপুর দ্বিরা দিয়ে রাস্তা। মাঠ জঙ্গলের ধার দিয়ে গিয়ে সোজা পৌঁছানো গেল কলবীলয়ার কিনারায়। কাটারিয়ার এপারে কলবালয়া যেখানে গিয়ে কুশীর সঙ্গে মিশেছে তার একটু এদিকে জল কম। বটেশপুর দ্বিরা থেকে কলাইএর বোঝা মাথায় নিয়ে মেয়েরা হেঁটে নদী পার হচ্ছে—সেই পথে ঘোড়া শুদ্ধ পার হয়ে গিয়ে কাটারিয়ার সামনে নতুন রেলপথের ধারে এক বাবলাবনের মধ্যে ঢুকে পড়লাম বেশ সুন্দর ছায়া. পশ্চিমে সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে—উঁচু নীচু ভূমি—দুটী মেয়েতে কাঠ ভাঙছিল। তারা বললে. এ রাস্তা নয় পুলে যাবার—সামনে দিয়ে পথ। সেখান থেকে নেমে নতুন বাঁধের নীচে যেতে হবে। কাটিহারের ট্রেনখানা বেরিয়ে গেল। একটা জলাতে দুটো বড় বড় জাঙিঘল পাখী বসে ছিল। বটেশপুর দ্বিরাতে এক ঝাঁক ঘ ঘু পথের পাশ দিয়ে উড়ে গেল—বন্দুকটার জন্যে হাত নিসপিস করে।

তারপর খাড়া উঁচু পথে বাঁধটার ওপর ঘোড়া উঠিয়ে পুলটার কাছে গেলাম। ডাইনে বাঁয়ে ঘন বাবলা বন ও তেলাকুচা ও অন্য অন্য লতাপাতার ঝোপ—সন্ধ্যার ছায়ায় শ্যামল শীতল। কাটারিয়ার ষ্টেশনের ওপারে লাল টকটকে সূর্য্যটা অস্ত গেল। তারপর সেখান থেকে ঘোড়া ফিরিয়ে আবার ঢালু দিয়ে তেলাকুচাঘেরা বাবলাবনটার মধ্যে নামলাম। জেলে দুটো যেখানে রেলবাঁধের নীচে খুপড়ী বেঁধে আছে, সেখান দিয়ে নেমে এলাম। তারপর বাবলাবনের পাশ দিয়ে এসে কলবীলয়া পার হয়ে জোরে ঘোড়া ছাড়লাম। খুব-বেলা গেলে আজ বেরিয়েছিলাম কিন্তু এতটা পথ গিয়ে আবার ফিরে এসে ভাল করে অন্ধকার হবার আগেই আজমাবাদ সীমনা ছাড়িয়ে জনকধারী সিংএর বাসার কাছে পৌঁছে গেলাম।

॥ ৮ই জানুয়ারী, ১৯২৮ ॥

আজ দুপুরের পর বটেশ্বরনাথ পাহাড়ে বেড়াতে গেলাম। অন্য অন্য বার যে পথ দিয়ে যাই আজ সে পথ দিয়ে যাই নি। গুহাটার সামনে দিয়ে একটা পথ গভীর বনের দিকে চলে গিয়েছে, সেদিকে গেলাম। কত কি বনের গাছ—

একটা পাথরের ওপর বসে বসে দূর পাহাড়ের ওপরকার বাঁশবনের শোভা দেখলাম। পাহাড়ের ওপর অনেক কাঞ্চনফুল গাছে ফুটে আছে। সেখান থেকে তলা দিয়ে গিয়ে গিয়ে গভীর একটা বনের কাছে পৌছালাম। কল্পনা করছিলাম—চাবুকটা যেন আমার ধনুক—বটগাছের যে ডালটা ভেঙে নিয়েছিলাম সেটা যেন আমার বাণ। সভ্য জগৎ থেকে দূরে এক বন্য আদিম মানুষের জীবন যাপন করতে আমার বড় ভাল লাগে। তাই গাছ যেখানে বড় ঘন, ঝোপ খুব নিবিড়—তারই নীচে দিয়ে শুকনো পাতার ওপর দিয়ে মচ মচ করতে করতে যাচ্ছিলাম। এক জায়গায় দেখলাম পাহাড়ের ওপর বন্য বেতের গাছ হয়েছে—এর আগে বটেশ্বর পাহাড়ে বন্য বেতের গাছ কখনও দেখি নি। অনেকক্ষণ পাথরটার ওপর বসে বসে কথা ভাবছিলাম—শৈশবে শুধু পিসিমা, হরি রায় এরাই আমার সঙ্গী ছিল না। সেই সঙ্গে সঙ্গে সত্যভামা, ভীষ্ম, সাত্যকি, অশ্বত্থমা এই সব পৌরাণিক চরিত্রও আমার কাছে বড জীবন্ত ছিল। আমাদের গ্রামে আশে পাশে বনে বাদাড়ে তাদেরও স্মৃতি শৈশবের সঙ্গে জড়ানো আছে যে! রোদ রাঙা হয়ে এলে পাহাড় থেকে নেমে নৌকায় উঠলাম। একটা ষ্টীমার সকাল থেকে চড়ায় আটকে আছে। একটা মেয়ে আমাদের সঙ্গে পার হচ্ছিল, তার বাপের সঙ্গে নতুন শ্বশুর বাড়ী যাচ্ছে। ঘোমটা খুলে কৌতূহল চোখে ষ্টীমারটা দেখতে লাগল। নিজে হাল ধরে নৌকা ঠিক ঘাটে লাগিয়ে দিলাম। রাম সাধোকে বললাম, তুমি ঝন্নুটোলা হয়ে চলে যাও। তারপর আমি ঘোড়া ছুটিয়ে নিজের অভ্যস্ত স্থানটিতে এসে দাঁড়ালাম। কত কথা মনে হয়—সেই আড়ংঘাটায় বাবার সঙ্গে যাওয়া, সেই চাঁপাপুকুর, কত কি? জীবনটা কি বিচিত্র, তাই শুধু ভাবি। সত্যবাবুদের বাড়ী থেকেও এর বিচিত্রতা যেমন দেখলাম—বাংলাদেশ থেকে বহুদূরে এই বিদেশে পাহাড় নদী বন গঙ্গা অস্তগামী রক্তসূর্য্যে বিচিত্রতার মধ্যেও তেমনি দেখছি।

খুব অন্ধকার হয়ে গেল। আকাশ-ভরা তারার নীচে দিয়ে অন্ধকারের মধ্যে ঘোড়া ছুটিয়ে ভীমদাসটোলা দিয়ে বাঁধের ওপর দিয়ে কাছারী ফিরলাম। পথ দেখতে পাই না—ঘোড়া শুধু আপনার ঝোঁকে কদমে চলে। শুধু আমি আর নির্জ্জন মাঠ, একরাশ অন্ধকার, নতুন জিনটার মস মস শব্দ ও মাথার ওপরে জ্বলজ্বলে বৃহস্পতি, দীর্ঘ ছায়াপথ।

কাল সকালে এখানে থেকে ভাগলপুর যাবো।

॥ ৯ই জানুয়ারী, ১৯২৮ ॥

আজ কাঞ্চনগড়ে গাড়ী করে গিয়ে বিভাসবাবুর সঙ্গে সব কথাবার্ত্তা কইলাম। তারপর। তারপর ফিরে এসে ক্লাবে চণ্ডীবাবু ও অমূল্যবাবুর সঙ্গে অনেকক্ষণ ধ'রে সাহিত্যচর্চ্চা করা করা গেল। কাল সকালে এক বোতল জ্যাম কিনে নিয়ে ইস্মানিপুর যাবো।

ক্লাবে মডার্ণ রিভিউ পড়ছিলাম। সিসিলিয়া মরলের লেখা বড় ভাল লাগল। প্রাচীন দর্শন, উপনিষদের এই তত্ত্ব বিদেশিনীর এত ভাল লেগেছে—বড় আনন্দ হ'ল। জীবনে জ্ঞানপিপাসু, উন্নতিপিপাসু, আধ্যাত্মিক পবিত্রতার জন্যে ব্যগ্র, ক্ষুধার্ত্ত আত্মা খুব কম। দু'একজনের সঙ্গে পরিচয় হ'লে বড় আনন্দ পাওয়া যায়।

এই কৌতূহল, এই ব্যগ্রতা, একটা কিছু হবো, আরও উন্নতি করবো... এইটাই আঁকবার। টমাস হেনরী রার্থ ফোর্ডের মত শত শত সুন্দর তরুণ যুবক প্রাচীনদিগের রাইনের প্রাসাদে প্রাসাদে—তাদের জীবন, দুঃখ, অদৃষ্ট মনে বড় লাগে। যে মেয়েটি কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে তার কথা জেনে মনে একটা বড় উৎসাহ হয়। এই জ্ঞান-সুধা যে জাতির মধ্যে আছে তারা যদি বড় না হয় তবে বড় হবে কে?

শৈশবের সে স্বপন দিন নাই। উত্তর জীবনে এই আধ্যাত্মিক ব্যগ্রতা, এই কৌতূহল, এই স্বপ্ন এই জীবনকে Realise করবার মতো ক্ষুধা—এইটাই আঁকবার।

॥ ১২ই জানুয়ারী ১৯২৮, ভাগলপুর ॥

পৌষ সংক্রান্তি। সকালে উঠে অনেকক্ষণ ধরে পড়াশুনা করা গেল। তারপরে বেলা হ'লে আমরা চার পাঁচ জনে গঙ্গাস্নান করতে গেলাম। রোদ বড় প্রখর লাগতে লাগল। ছোট জলাটা পার হয়ে আমি ও নায়েববাবু ওপারের চড়ার পারে বড় গঙ্গায় নাইতে গেলাম। আমি আসবার সময় গল্প করছিলাম, সেদিন বটেশ্বর নাথের পাহাড়ে বেড়াতে গিয়ে নেমে আসবার সময় অত্যন্ত তৃষ্ণায় সেই বৈকালের ছায়াভরা পাথরের ঘাটটিতে পাণ্ডাঠাকুরের গেলাসে করে সেই নির্ম্মল শীতল গঙ্গার জল যে খেয়েছিলাম—তার কথা। ফিরে এসে নতুন ঘরের নিকানোপোছানো দাওয়ায় চেয়ার পেতে বসে ভাবছিলাম, বাংলাদেশে বসন্তদিন আসছে—সেই প্রথম গা-নাচানো মন-মাতানো দখিন হাওয়া, সেই পাতা-সাজানো বৈচিগাছ, বাতাবীলেবু ফুলের গন্ধ, কোকিলের ডাক, সেই দিনগুলো। জীবনকে প্রাণভরে ভোগ করাই জীবনের সার্থকতা।

উদারভাবে প্রসারিত মনে ভোগ বা বেঁচে থাকবার আর্ট। এটুকুও শিখতে হয়।

॥ ১৪ই জানুয়ারী, ১৯২৮, ইসমানিপুর ॥

বৈকালে ঘোড়া করে বেড়াতে বেরুলাম। লোধাই টোলার ওদিকে জলার ধারের রাঁইচীক্ষেতের দিকে আকাশটা কি সুন্দর দেখাচ্ছিল—এত রাঁইচীফুল ফুটে আছে—দূরে সন্ধ্যার ধূসর আকাশের নীচে উন্মুক্ত দূরপ্রসারী হলুদরং-এর রাঁইচীক্ষেত কি সুন্দরই দেখাচ্ছিল। এই শুকনো কাশবনের সোঁদা সোঁদা ছাযাভরা গন্ধ, এই উদার নীল আকাশ, এই ঘনশ্যাম শস্য ক্ষেত্র, এই নির্ম্মল বাতাস, চখাচখির সারি, দূরের ধূসর পাহাড়রাজি, এই গতির বেগ—সব শুদ্ধ মিলে জীবনকে পরিপূর্ণতা ও সাফল্যের তৃপ্তিতে ভরিয়ে দেয়। আমি না ভেবে পারিনে যে এই উন্মুক্ত উদার গতিশীল যাত্রাপথের পথিক যারা নয় জীবন সম্পদে তারা দীন।

বসিরহাট থেকে পত্র এসেছে বহুদিন পরে পাটালি পাঠানোর জন্যে। বহুদিনের কথা মনে পড়ে। ৬০, মির্জাপুরের কলেজ হোষ্টেলে এই শীতের দিনের যে অপূর্ব্ব দিনগুলো—সেই প্রথম যৌবনের দীপ্ত উৎসাহ, মায়াজগতের স্বপ্ন, শিশিরবাবুর অভিনয় 'ইন্‌ষ্টিটিউটে' দেখে এসে পথের মোড়ে ফুটপাথে তাই নিয়ে মেতে থাকা! তারও আগে এই প্রথম বসন্তের দিনে রমাপ্রসন্নের জন্যে ফাল্গুনী দেখতে যাওয়া—সেই 'ফাগুন লেগেছে বনে বনে'—সেই ভূতনাথের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে তার সঙ্গে Landor পড়ার দিনগুলো। সেই গ্রামের বসন্ত দেখেছি ১৯১৭ সালে—এই দশ বৎসরের মধ্যে তা আর হয়নি।

॥ ১৬ই জানুয়ারী, ১৯২৮ ॥

আজ এত জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে না এলে কি ষ্টীমার ধরতে পারতাম? জঙ্গল থেকে বার হয়েই দেখি ষ্টীমার এপারে। ভাগ্যিস ছিল ছোট ঘোড়াটা—বালির চর বেয়ে ঝড়ের বেগে ঘোড়া উড়িয়ে তবে এসে ষ্টীমারের ছাড়বার ঘণ্টা দেবার সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছে গেলাম ঘাটে।

দেবীবাবুর ধর্ম্মশালায় উঠেছি আজ। একবার সরাইখানার অভিজ্ঞতাটা হোক না? দুনিয়াটা তো একটা বৃহৎ ধর্ম্মশালা—বড়র মধ্যে যে জিনিসটা ছোট অথচ বড়রই প্রতীক সেটাকে চিনে নি।

পাশের ঘরে কে একজন গান গাচ্ছে আর বেহালা বাজাচ্ছে—বাঙ্গালী মনে হচ্ছে। 'ওগো মাঝি তরী হেথা' গান ধরেছে।

একটা জিনিষ নতুন ঠেকছে। কয়দিন হাতে অনেক কাজ, দেখি কি করি।

আজ ছিল বৃহস্পতিবার—আমাদের দেশের হাটবার। ষ্টীমারের ডেকে ব'সে ব'সে কেবল মনে ভেবেছি আমাদের বাঁশ বনে ঘেরা ভিটাটিতে দূর শৈশবের একদিনে সামনের পুরোনো পাচালটা দেখতে দেখতে হাটে বেরুচ্ছি। খানসামা চা দিয়ে গেল, চুমুক দিতে দিতে বার বার সেই কথাই মনে আসতে লাগল। উপরের ডেক আজ ছিল বড় নির্জ্জন, ব'সে ভাববার বড় সুবিধা।

মানসিক ঘুম ব'লে একটা জিনিস আছে—শারীরিক ঘুমের চেয়েও তাতে মানুষকে লক্ষীছাড়া ক'রে ফেলে। দেহে সজাগ থাকা কঠিন না হ'তে পারে কিন্তু মনে সজাগ থাকা কঠোর সাধনার ওপর নির্ভর করে। সেটা মাঝে মাঝে বুঝতে পারি।

॥ ১৮ই জানুয়ারী, ১৯২৮ ॥

এই দিনটাতে বড আনন্দ পেয়েছিলাম সাজকীরটিলায়। দুপুরের পর আজ হেঁটে সাজকী চ'লে গেলাম। উঁচু টিলাটার ওপর তেতুলগাছটার তলায় চুপ ক'রে অনেকক্ষণ নির্জ্জনে ব'সে ব'সে চারদিকের রৌদ্রদীপ্ত মধ্যাহ্নের অপূর্ব্ব শান্তির মধ্যে শ্যামল তালশীর্ষগুলোর দিকে চেয়ে রইলাম। কত বছর আগেকার সে শৈশব সুরটা যেন বাজে—এক পুরোনো শান্ত দুপুরের রহস্যময় সুর। কত দিগন্তব্যাপী মাঠের মধ্যে এই শান্ত দুপুরে কত বটের তলা, কত মধ্যাহ্ন আবার যেন ফিরে আসে পচিশ বছর পরে।

এই শান্ত স্তব্ধ মধ্যাহ্নে কেবলই মনে পড়ে জীবনটা কি—তা ভেবে দেখতে হবে। এই পঞ্চাশ ষাট বছরের এবারকার মত জীবনে কি সারাজীবন ফুরিয়ে গেল? এই দুপুর, এই প্রথম বসন্তের আবেশ, এই নীল আকাশ, এই বাঁশের শুকনো পাতা ও দোলার আহ্বান, তেলাকুচালতার দুলুনি—এ সব যে বড় ভাল লাগে।

কে জানে হয়তো যদি আসতেই হয় তবে হাজার বছর পরে। কারণ পার্থিব জীবন ছাড়া আরও একটা অপার্থিব জীবন ধারা কল্পনা করতে পারা যায় যাতে আনন্দ বা সৌন্দর্য্য আরও ক্রমপরিস্ফুট হবে—সৌন্দর্য্যের সত্যের উপভোগই জীবনের উদ্দেশ্য, এ সম্বন্ধে আমার কোনো সন্দেহ নাই।

তা যদি হয় তাতে সময় নেবে। হাজার বছর না হয় পাচশো বছরও হ'তে পারে। এসব বিষয়ে কিছুই নিশ্চয়তা নাই। চিন্তার গোড়ামী আমি বড় অপছন্দ করি, স্থিতিস্থাপক মন না হ'লে সত্যদর্শী হওয়া বড় শক্ত। কাজেই যদি ধ'রে নেওয়া যায় ওপরের কথাটাই সত্য তো এই পৃথিবীর আলো হাওয়া জল মাটির কাছ থেকে বিদায় নিতে হবে? তাই নীরব রহস্যভরা মধ্যাহ্নে সেই বিদায়-বেদনার সুর বড় বাজে।

অমর বাবু, উপেনবাবুর সঙ্গে রনজিৎবাবুর বাড়ী যাওয়া গেল। ফিরে আসতে আসতে কথা হ'ল আমরা বেদের দল, তাঁবু ফেলে ফেলে বেড়াচ্ছি। রাখাল বাবু চলেন কলেজে—উপেনবাবু তল্পি নিয়েই মঙ্গলবারে কলকাতা। ভাগলপুর শূন্য হয়ে পড়েছে। কাল আবার সঙ্গীতসমাজে Recitation এ বিচারকের আসন গ্রহণ করতে হবে।

॥ ২১শে জানুয়ারী, ১৯২৮ ॥

সঙ্গীতসমাজে আবৃত্তির প্রতিযোগিতায় বিচারকর্গিরি করতে গেলাম বেলা তিনটার সময়। সেখানে একটা ছেলে বড় সুন্দর আবৃত্তি করলে। সেখান থেকে চণ্ডীবাবু অম্বিকাবাবু ও আমি গেলাম ক্লাবে। সেখান থেকে চা-এর নিমন্ত্রণে গেলাম। সারাদিন Engagementএর ভিতর দিয়ে দিনটি বেশ গেল।

একদিকে যেমন সরল সহজ জীবন দরকার অন্যদিক থেকে আলো শিল্প সৌন্দর্য্য সঙ্গীতও যে বিশেষ প্রয়োজনীয় এটা ভুলে গেলেও তো চলবে না!

॥ ২২শে জানুয়ারী, ১৯২৮ ॥

কাল যেমন সারাদিনটি বাদলা গিয়েছে ঘোরাও গিয়েছে সারাদিন খুব। বেলা চারটার সময় বেরিয়ে ভিজতে ভিজতে উপেনবাবুর বাড়ী, সেখান থেকে ষ্টেশনে উপেনবাবুর টিকিট বিক্রী ক'রতে। সেখান থেকে ধর্ম্মশালায় খেয়েই বেরুনো হ'ল চণ্ডীবাবুর বাড়ী। সেখানে থেকে অমরবাবুর বাড়ী হ'য়ে উপেনবাবুর বাড়ী গিয়ে রাত কাটানো গেল। সকালে উঠে চা খেয়ে সেখান থেকে এলাম সুরেন বাবুর বাড়ী। তারপর ধর্ম্মতলায় ব'সেই ইসমানিপুর রওনা হওয়া গেল। খুব মেঘ মাথায়, ঘোড়াটা জোরে ছুটীয়ে ভিজে কাশের গন্ধ উপভোগ করতে করতে এলাম কাছারীতে।

পরদিন বৈকালে বর্ষণসিক্ত সবুজ কচি গমের ক্ষেত ও হলুদ রংএর ফুলে ভরা রাই ক্ষেতের ভিতর দিয়ে ঘোড়াটা নিয়ে বেড়াতে গেলাম। দূরের পাহাড়গুলো আবার পরিষ্কার নীল রং ধরেছে—বৃষ্টি-ধোয়া আকাশের তলে সবুজ গম ক্ষেত ও হলুদ রংএর সমুদ্রের মত ফুলে ভরা রাই ক্ষেত আমার চোখে কি মোহ-অঞ্জন যে পরিয়ে দিল! ঈশ্বর ঝা ধে'লাই টোলা থেকে বেরিয়ে দুঃখের কথা বলতে বলতে আমার ঘোড়ার পিছু পিছু কুণ্ডীর কাছাকাছি গেল। সেখান থেকে সে পথে গঙ্গা দেখে ফিরলাম। বালা মণ্ডলের টোলা আসতে আসতে অন্ধকার হ'য়ে গেল। কিন্তু ঘোড়াটা যা ছুটল! শুয়োরে যেসব ক্ষেত খুঁড়ে ফেলেছে তার মধ্য দিয়ে খুব জোরে ঘোড়া ছুটল।

॥ ২৭শে জানুয়ারী, ১৯২৮ ॥

এ জীবনে প্রথম দেখলাম সরস্বতী পূজোর দিন এভাবের বাদলা হয়। দুপুর থেকে আকাশ অন্ধকার ক'রে টিপ টিপ বিষ্টি পড়ছে। এমন সন্ধ্যাবেলা টেবিলে আলো জ্বলছে, আমার বাংলো ঘরটায় ব'সে আপন মনে লিখছি—চারধার অন্ধকার ক'রে বেশী জোরে বিষ্টি পড়ছে—ঠিক যেন ছেলেবেলার এক শ্রাবণ মাসের বর্ষণমুখর সন্ধ্যা। অথচ এটা বসন্তকালের প্রথম দিনটা—যে সময় কলকাতায় গান করতাম 'ফাগুন লেগেছে বনে বনে'। আজ অনেক লোক খাবে, ব'লে দেওয়া হ'য়েছিল—কিন্তু দই আসেনি বলে ঘোড়া নিয়ে মুকুন্দী চ'লে গেল বাসনাকুণ্ডু। বায়না ক'রে সরস্বতী পূজোর আয়োজন হ'ল ঠিক আর বছরের মত। ঈশ্বর ঝা পূজো করতে এল, আমি ও গোষ্ঠবাবু ঠাকুর সাজালাম। নায়েব মশায়ের বাসা থেকে পিঁড়ি আলপনা দিয়ে নিয়ে আসা হ'ল। বাবার পশ্চিম ভ্রমণের ডায়েরীটা ও রামায়ণ খানা বার ক'রে দিলাম ঠাকুরের পিঁড়িতে। বাবার খাতা খানা নিজের হাতে চন্দন মাখিয়ে ও ফুল সাজিয়ে বড় আনন্দ পেলাম। তিনি কি জানতেন তার মৃত্যুর পনের বছর পরে প্রথম যৌবনে তার ছেঁড়া খেড়ো লেখা খাতাখানা বিহারের এক নির্জ্জন কাশ বনের চরের মধ্যে ফুল চন্দন দিয়ে অর্চ্চিত হবে?

ঈশ্বর ঝা ও তার ভাইকে দাঁড়িয়ে থেকে খাওয়ালাম। ওরা রসগোল্লা এদের দিতে চায় না—হুকুম দিয়ে আনালাম, এদের দিলাম। রামচন্দ্রসিং আমীনকে লোক পাঠিয়ে আনিয়ে নিয়ে প্রসাদ খাওয়ালাম। তারপর ধাঙ্গোড়রা বাইরে বৃষ্টি মাথায় খেতে বসলো। আমি গিয়ে দাঁড়িয়ে তাদের খাওয়ালাম।

প্যাঁড়া মহুয়া দই ও একটু একটু ক'রে গুড় পেয়ে সেই টিপ টিপ বাদলের দিনে ঠাণ্ডা কন্‌কনে হাওয়ায় বর্ষণমুখর আকাশের নীচে অনাবৃত মাঠে ব'সে খেতে খেতে তাদের উৎসাহ লোভ আনন্দ দেখে চোখে জল এল।

করুয়া চামার ছেলেপিলে নিয়ে অন্ধকারে ঘোর বৃষ্টির মধ্যে ভিজে ভিজে ময়লা গামছা পেতে মাড়া পাচ্ছে ও চেঁচাচ্ছে--গুখা আচ্ছি মালিক, হে মালিক খোড়াগুড। সিকলা পরিবেশন করছে, কিন্তু তার কথা কেউ কান দিচ্ছে না। ওরা যখন ভিজছে তখন আমার ঘরে ব'সে আরাম করবার কোন অধিকার নেই ভেবে আমিও ভিজতে ভিজতে গিয়ে সেখানে দাঁড়ালাম ও হুকুম দিয়ে তাকে ও তাদের ছেলেদের আরও দই গুড আনিয়ে দিলাম।

অন্ধকার বৃষ্টিধারায় ধোঁয়াকার ধূ ধূ মাঠের দিকে চেয়ে মনে পড়ল, কতকালের সেই জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে সরস্বতীপূজোতে কুঠীর মাঠে নীলকণ্ঠ পাখী দেখতে যাওয়া।

কতকাল—কতকাল আগে—

জীবন কি অদ্ভুত, তাই মনে মনে ভাবি—

সেদিন সাজকীর সেই অপূর্ব্ব দুপুরটা মনে প'ড়ছে। সেই রৌদ্রদীপ্ত তালবৃক্ষশ্রেণী, সেই অপূর্ব্ব শৈশব স্মৃতিটা—সার্থক ছিল সে যাত্রা আমার। শুভক্ষণে ধর্ম্মশালা থেকে বেরিয়েছিলাম।

বড় লোকের বাড়ীর অভিজ্ঞতাটুকু লিখছি।

রামচন্দ্র সিং আমীনকে আমার বড় ভাল লাগে। একা জঙ্গলের ধারে থাকে। আমোদ উৎসবে ওকে কেউ ডাকে না। বড় শুদ্ধ সত্ত্ব লোক। তাই আজ ওকে ডেকেছি। প্রসাদ পেয়ে স্ফূর্ত্তিতে কাছারী ঘরে বসে গান করছে—

তেরা গতি লখি না পারিয়া—

হরিচন্দর, রাজা…পিয়ে ডোম ঘরে শনিদয়া হোইজী…

আর বারের মত। সেই আমার ভয়ানক Home sickness, পশ্চিমে হাওয়া—হীরেন বাবু কালীঘরে লিখবার টেবিল……দূর পোয়ানো……জঙ্গলের মাথায় চাঁদ ওঠা।

খুব হাসছে, আর গাইছে :

একলাখ পুত সওয়া লাখ নাতি

সকরি কোই নাম আয়ি—

দয়া হোই জী……

'কোই নাম আয়া' অংশটা বার বার জোর দিয়ে গাইছে। গোষ্ঠ বাবুও মহা উৎসাহে কীর্ত্তন করছে। রামচরিত ভিজতে ভিজতে নওগাছিয়া ডাকঘর থেকে এসে বললে, চিঠিপত্তর কিছু নেই!

॥ ২৭শে জানুয়ারী, ১৯২৮ ॥

আজ সবুজ গম রাঁইচাক্ষেতে অনেকক্ষণ বেড়িয়ে এলাম। ফিরে এলে গোষ্ঠ বাবু ঘরে এসে অনেকক্ষণ গল্প করলে। ছটু সিংএর পাঠানো পেয়ারা খাওয়া গেল।

সন্ধ্যাবেলা অনেক দিন পরে দেশের কুঠীর মাঠের একটা দিনের ঘটনার ছবি অস্পষ্ট মনে এল। নতুন বোষ্টমীর আখড়ার পেছন দিকের রাস্তাটা দিয়ে একদিন সকালে কুটীর মাঠের দিকে যাওয়া। আটির নীচের ক্ষেতে কে নতুন চষেছে—জ্যাঠামশায় মা কে সঙ্গে আছেন—ফিরে এলাম।

সে কি প্রথম দিনটা কুঠী যাওয়া? ভাল মনে হয় না।

সেই সময়ের মনের ভাবগুলো বেশ ধরা যায়। ঐ দিনটা স্পষ্ট মনে এলে ঐ দিনের—প চিশ বৎসর পুর্ব্বেকার শৈশবের এক হারানো দিনের ভাবনাটাও স্পষ্ট মনে পড়ে। দুটো এক ফটোগ্রাফের প্লেটে তোলা ছবি একত্রে মস্তিষ্কের কোথায় যেন আছে—এতদিন কত অন্য প্লেটের তলে চাপা পড়েছিল—আজ হঠাৎ হাত পড়েছে।

॥ ২৮শে জানুয়ারী, ১৯২৮ ॥

অপূর্ব্ব জ্যোৎস্না রাত্রি! এরকম রাত্রি দ্বিরা ছাড়া অন্য কোথাও দেখা যায় না—আর দেখা যায় বড় বাসার ছাদে। চারধার নিস্তব্ধ, সামনের কাশবনের মাথায় দুগ্ধশুভ্র জ্যোৎস্নাধৌত আকাশে রহস্যময় তারার দল। শুধুই মনে পড়ে, জীবনটা কি বিচিত্র রহস্য—এ শুধু একটা বিচিত্র, অনন্ত রহস্য, এর সব দিকেই অসীমতা—যেদিকে যাওয়া যায়। চাঁপাপুকুরের সেই যে বাড়ীটাতে নিমন্ত্রণ করেছিল, আমাদের গ্রামের সেই দশ-বিঘা দানের বাশবন, বড় চারা আম তলায়, জাঙ্গিপাড়ার স্কুলের সামনের মাঠে—এরকম জ্যোৎস্না পড়েছে আজ—যখন এই সব বিভিন্ন স্থান ও তৎসংশ্লিষ্ট স্মৃতির কথা মনে ভাবি তখনই হঠাৎ জীবনের বিচিত্রতা প্রগাঢ় রহস্য আলাকে অভিভূত করে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখ গিয়ে পড়ে অনন্ত আকাশের নক্ষত্ররাজির উপর—কে জানে ওর চারপাশের অন্ধকার গ্রহদলের মধ্যে মধ্যে কি বিচিত্র জীবন-ধারা-প্রবাহ

চলেছে। কোন্ দেববালকের মায়াময় শৈশব স্বপ্ন-দেশের গাছপালা ভূমিশ্রীর মধ্যে কাটছে যুগে যুগে—অপূর্ব্ব দেবতার লীলাভূমি কত সৌন্দর্য্য ভরা নব নব জগৎ—কত উচ্চস্তরের জীবকুল।

হাজার হাজার বর্ষস্থায়ী বিচিত্র প্রেম তাদের জন্ম জন্মান্তরের মধ্যে দিয়ে অনন্ত জীবন মৃত্যু বিরহমিলনের ভিতরে অক্ষুন্ন, চির সঞ্জীব ধারায় বেয়ে চলে—কত সভ্যতার উত্থান পতনের মধ্যে দিয়ে, কত পৃথিবীর ধ্বংসসৃষ্টির তালে তালে। প্রাচীন ইজিপ্টের সে রাজকন্যার আত্মার কথা মনে পড়ে। এক বত্রিশ বৎসরের জীবনে যদি এই আনন্দের এই প্রাচুর্য্য, অনন্ত জীবন পথের পথিকদের হাজার হাজার বৎসর স্মৃতির মধ্যে কি অমৃত সঞ্চিত আছে—যদি অমৃতের পুত্রেরা তাদের সত্যকার অধিকার না হারিয়ে ফেলে? জন্মে জন্মে যুগে যুগে হারানো প্রেম ফিরে পাওয়া স্বপ্ন না কল্পনা, না বাস্তব?

মৃত্যুর ওপারেও কি কল্পনা ধ্যান চলবে? সেখানে তো লেখা নাই—আধ্যাত্মিকতায় আগ্রহ নাই, তবে কোন্ উদ্দেশ্যে মানুষের কর্ম্ম প্রবাহ? হয় তো সেখানে তার উত্তর মিলবে।

আমি এই আকাশ, এই তারাদল, এই অপূর্ব্ব জ্যোৎস্নারাত্রি, এই নির্জ্জন মুক্ত জীবন ভালবাসি। প্রাণভ'রে ভালবাসি। বাংলার বারান্দায় ডেকচেয়ার পেতে বহুদূরের জ্যোৎস্নাভরা আকাশের দিকে একমনে চেয়ে রইলাম—কালীধরের নীচেই যে জঙ্গল আরম্ভ হয়েছে তার মাথা দিয়ে জ্যোৎস্নার ঢেউ ব'য়ে যাচ্ছে। অনন্ত দেশের রহস্য বার্ত্তার মত একটা বড় নক্ষত্র নির্জ্জন ঝাউ ঝাড়ের মাথায় জ্বল জ্বল করছে—হু হু পশ্চিমে হাওয়া বইছে—কি এক অপূর্ব্ব রহস্য মনে যে নিয়ে আসে! কি সব চিন্তা আনে? কি মাধুর্য্য......মনকে কোথায় যে নিয়ে গিয়ে ফেলে! কেবল বহুদূরের কথা মনে পড়ে। আজ কাছারীর সামনে কাশজঙ্গলে সূর্য্যাস্তের সময় বেড়াতে গেলাম। গভীর নির্জ্জনতা শুকনো কাশের ভরপুর গন্ধ—বাঁকাডাল বড় ঝাউএর ঝোপ—শুকনো খটখটে মাটির গন্ধ—সোঁদা সোঁদা—অনেকদূরে ভাগলপুরে গঙ্গার ওপর রাঙা সূর্য্যটা হেলে পড়েছে।

এই অপূর্ব্ব সূর্য্যাস্ত এদেশের নিজস্ব সম্পত্তি। এর সঙ্গে পরিচয় এদেশে এসে—বিহারের এই দিগন্তব্যাপী মাঠ, চরের মধ্যেই দিগন্তলক্ষ্মীর ললাট-রক্ত সিন্দূর বিন্দুর মত অপূর্ব্ব অস্তসূর্য্য সবুজের সমুদ্রের মত শস্যক্ষেতের ওপর যখন ঢলে পড়ে তখনই মনে হয় অনন্ত অন্তরতম অন্তরকে হাতছানি দিয়ে ডাক

দিচ্ছে—আমার উদ্দাম মুক্তিকামী স্বাধীনতাপ্রিয় মন এই প্রসারতা এত নির্জ্জন বন্য সৌন্দর্য্যের কর্কশ প্রাচুর্য্যে মুগ্ধ হ'ল, সার্থক হ'ল।

তাই আজ ভাবছিলাম জীবনে কেউ শত্রু নয়—অল্পদিনের ব্যবধানে যাকে মনে হয় অমিত্র, দূরের ব্যবধানে তাকে দেখা যায় সে জীবনে পরম মিত্রের কাজ করেছে। রাজকুমার বাবু, খুকা—এ দু'জনের মত মিত্র কে?

আমার প্রসারতাপ্রিয় নির্জ্জনতাকামী মনকে ধ্যানের অবসর এরাই না যুগিয়েছে? ভগবান এদের আত্মাকে আজকারের জ্যোৎস্না ধারার মত শুভ্র করুন।

কাল সকালে উঠে জোয়ান ক্ষেত দেখতে দেখতে মুক্তিনাথের স্ত্রীর আদ্য শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণে বাসনাপুর যাবো। সকালে রামগিরিতে রামের ঘোড়াটা যাবে ঠিক হ'ল, ও রামধনিয়া চাকর ব্যাগ নিয়ে যাবে। ভাটলি গোটা দেখে আমি ঘোড়া নিয়ে ঐ পথে অমনি চ'লে যাবো জোয়ান ক্ষেতে, সেখান গণপৎ তহশীলদার ও মোহিনীবাবু আমার উপস্থিত থাকবেন। পরে কাছাবীতে গিয়ে গঙ্গাস্নান করে আহারাদির পর বৈকালে ফিরবো।

বড় ভাল লাগে এই উন্মুক্ত জীবন বড় ভাল লাগে এই দিবা, এত অপূর্ব্ব জ্যোৎস্না রাত্রি, এই বন কাশ ঝোপ, দূরের নীল পাহাড় দুটি—এই ঘোড়ায় চড়া, এই বনে ফুলের গন্ধ, সকলের চেয়ে মনকে চারপাশে ছড়িয়ে দেবার এই অপূর্ব্ব অবকাশ!

বাঙ্গালী মণ্ডল আজ এক ঝুড়ি কুল নিয়ে আজমাবাদ থেকে এসেছে। ওদের বথশীষের কম্বল নিয়ে যাবে।

সকালে বার হ'য়ে ঘোড়া ক'রে রাহ ক্ষেত দেখে পরশু রামপুর চ'লে গেলাম। সেখানে বহুদিন পরে কলবীলয়ায় অবগাহন স্নান করা গেল। দূরে কহন গাঁয়ের নীল পাহাড়টা বড় ভাল লাগছিল। খাওয়া দাওয়া সেরে একটু বিশ্রাম করার পরেই গোষ্ঠবাবু ও আমি হেঁটে বার হলাম। সত্যি, হাঁটার মধ্যে এমন একটা জিনিস আছে যা ঘোড়ায় চ'ড়ে পাওয়া যায় না! নাঢাবইহারের কাছে দূরপ্রসারী ঘন শ্যামল যব গমের ক্ষেত, আকাশে উড্ডীয়মান বলাকার সারি বড় ভাল লাগছিল—বহুকাল পরে অনেক দূর পায়ে হেঁটে যাওয়ার সুখ অনুভব করলাম। পথের পাশেই নীল ফুলে ভরা খেঁষারীর ক্ষেত, চন্দন রংএর ফুলে ভরা মটর ক্ষেত, কোথাও আধশুকনো দুর্ব্বা ঘাসের ক্ষেত! গোষ্ঠবাবু আসতে আসতে আবার কল্লর চৌধুরীর ক্ষেতের কাছে এসে পথ হারিয়ে ফেললে। আধশুকনো দুর্ব্বাঘাসের ঘন কাশবনের মধ্যে দিয়ে সুঁড়ি পথ বেয়ে অনেক দূরে এলাম—আর

বছরে সেই তেলির ক্ষেতে (যেখানে নীল গাই দেখেছিলাম) যাবার সময় যে রকম শুঁড়ি পথ দিয়ে যেতাম সেরকম। তারপরে কেবলই সবুজ সমুদ্রের মত শস্য ক্ষেত্র—দিক দিগন্তহীন দূর, দূর সুদূর প্রসারী আকাশ। অপূর্ব্ব এ দ্বিরার দৃশ্য! এরকম নীল আকাশ, এরকম পাহাড়, এ রংএর দূরপ্রসারী শ্যামলতার সমুদ্র আর কোথায়? মাঝে মাঝে বন্য শূয়োরে শস্যক্ষেত খুঁড়ে ফেলেছে। গভীর জঙ্গলের মধ্যে নির্জ্জন ফসলের ক্ষেত। এই গভীর বনের ধারে একটা কাশের তৈরী কুঁড়ে—তাতেই চাষী রাত্রে শুয়ে এই ভীষণ হিমবর্ষী রাত্রে ফসল চৌকী দেয়। ওরা পথ হারিয়ে গেল—মালী ঘোড়া নিয়ে আসছিল। সে বললে, এ কোথায় এলাম? গোষ্ঠবাবুও দিশাহারা হ'য়ে গেল। আমিও প্রথমটা ঠাহর করতে পেরে উঠলাম না। পরে সিধা পথ পেয়ে খানিকটা আসতে আসতে দূরে কতকগুলো কাশের ঘর দেখে আমি বললাম, এই বালা মণ্ডলের টোলা। গোষ্ঠবাবু বললেন, না। আমি কিন্তু আর খানিকটা এসে বাঁ-ধারে যে পথে লোধাইটোলা, ঘোড়া ক'রে গিয়ে সে পথটা দেখতে পেলাম। তারপর হেঁটে খানাটা পার হ'যে হুকুমচাঁদের বাসার কাছ দিয়ে মানুষ সমান উঁচু রেড়ীক্ষেত দিয়ে এলাম। মকুন্দী ও জহুরী আজই বৈদ্যনাথ থেকে ফিরে এসেছে। প্রসাদ দিয়ে গেল। মুকুন্দীকে বললাম, তুমি আমার কাছে আজ রাত্রিতে গল্প ক'রবে। বড় আনন্দের দিনগুলো এসব।

অভিজ্ঞায় একটা বুঝলাম, আজ যে স্থানটা নতুন, ভাল লাগে না, মন বসে না, যত দিন যায়, যত তার সঙ্গে স্মৃতির যোগ হ'তে থাকে, ততই সেটা মধুর হ'য়ে ওঠে। এই ইসমানিপুর ১৯২৪ সালে আন্দামান দ্বীপের মত ঠেকতো। আজমাবাদকে তো মনে হোত (১৯২৫ সালেও) সভ্য জগতের প্রান্ত ভাগ—জঙ্গলে ভরা বেলজিয়াম কঙ্গোর কোন নির্জ্জন উপনিবেশ—আজ কাল সেই আজমাবাদ, এই ইসমানিপুর ছেড়ে যেতে হবে ভেবে কষ্ট হচ্ছে!

আজ এমার্সনের "Immortality" প্রবন্ধটা প'ড়ে মনে হ'ল আমার মনের কথা অবিকল তাতে লেখা আছে। কতদিন ব'সে ব'সে ভেবেছি, অন্য জগতের জীবনেও নিশ্চয় চিন্তা, পড়াশুনা, একটা কিছু কাজ নিয়ে থাকবার প্রচুর অবকাশ আছে। হাজার বছর কেটে যেতে পারে তবুও ব্যক্তিত্ব নষ্ট হবার কারন কি? ত্রিশ-বত্রিশ বছরের স্মৃতিভাণ্ডার যদি এ মধুকে পরিবেশন করে তবে অনন্ত জীবন পথে দুশো তিনশো বছরের স্মৃতির ঐশ্বয্য কি, তা ভাবলেও পুলকে শিউরে উঠতে হয়—হাজার বছরের? দুই হাজার বছরের? বিশ হাজার কি লক্ষ বছরের!

॥ নবমী, ৩১শে জানুয়ারী, ১৯২৮॥

কাল রাত্তির থেকে খুব বৃষ্টি চ'লছিল। ভাবলাম বুঝি সকালে বটেশ্বর নাথ মেলা দেখতে যাওয়া হবে না। সকালে উঠে হু হু পশ্চিমে বাতাস দিচ্ছে। ভাগলপুরে রদ্দুর উঠছে, মেঘ উড়িয়ে নিয়ে ফেলছে পূর্ব্ব-উত্তর কোণে। কণ্টু মিত্র যাবার জন্য তৈরী হ'ল—অনেক লোক বটেশ্বরনাথ স্নান করতে চ'লছে। আমিও স্নান ক'রে নিয়ে ঘোড়া'য় উঠবো।

ঘোড়া নিয়ে বালাটোলার মাঠে খুব যব খাওয়ালাম। সেখান থেকে খানিকটা যেতে ঘোড়ার পেটী আলগা হ'য়ে গেল কিন্তু একটা লোককে ডাকিয়ে সেটা ঠিক করে নিয়ে আবার ঘোড়া ছাড়লাম। কলবিলয়ার মাহ তাম্ সহিস দাঁড়িয়েছিল, তাকে দিয়ে পেটি কমিয়ে ঘোড়া ছেড়ে দিলাম। তিনটাঙার পথটা বেশ ভাল—গাছপালা, আলোক লতার জাল, ছায়া—খানিকদূর যেতে যেতে মেলায় লোক সারবন্দী হ'য়ে যাচ্ছে দেখলাম—রাঙা কাপড় পরা মেয়ের দল, গরুর গাড়ীর সারি। মেলায় পৌঁছে এদিকে ওদিকে খুব বেড়ানো গেল। পরে ঘোড়া ছেড়ে লোকপূর্ণ পথ দিয়ে রওনা হ'লাম। একস্থানে অতি নিরীহ গোবেচারী ভীতু প্রকৃতির একজনকে দেখলাম। ব্রহ্মমণ্ডলের তাঁবুতে সে টাকাপয়সা কাপড়ে বেঁধে নিয়ে এসছিল। মেয়েরা পরস্পরের সঙ্গে দেখা হ'লে মরাকান্না কাঁদে—এ আগে কখনো দেখি নি। যখন কুড়ারী তিনটাঙার ওধারের পথে আছি, তখনই সূর্য্য হেলে পড়েছে—খুব ঝাঁড়া গাছের ছায়া, পাশেই সবুজ গমক্ষেত সুগন্ধভরা! ঘুঘু পাখী বনের ছায়ায় ডাকছে—মনে হ'ল কেমন সেই গত পঞ্চমীতে দেশের কুঠীর মাঠ থেকে কুল খেয়ে এসে আজ পঁচিশ বছর পরে বাড়ীর পিছনে বাঁশবনে ব'সেছিলাম। সে স্থানটিতে এরকম বাঁকা রদ্দুর প'ড়েছে—রবিবার আজ যে, দেশে পঞ্চানন-তলার কাছ দিয়ে হাট ক'রে নিয়ে যাচ্ছে। বলছে, বেগুনের কত দর আজ হাটে? ঝুরি দোলানো পথ দিয়ে মাধবপুর নতিডাঙ্গার হাট ক'রে ফিরছে। আরও খানিকটা এসে একজন বললে, বড় রাস্তার খানিকটা গিয়ে পশ্চিম দিকে বাসনা পুকুর রাস্তা পাওয়া যাবে। সে পথে আসতে আসতে জয়পাল কুমারের বাড়ী। কাছের জঙ্গলে দুটো বন্যশূয়োর একেবারে সামনে প'ড়ল। তারপরই সোজা পশ্চিমমুখে পথ—ঘন ছায়াভরা ওধার থেকে অস্ত সূর্য্যের রাঙা, ম্লান আলো বাঁকা হ'য়ে মুখে প'ড়েছে। সেই ঘুঘুর ডাক বড় ভাল লাগছিল। পথ ঠিক আছে কিনা জানতে সামনের একদল মেলাফেরতা যাত্রীকে জিজ্ঞাসা করতে তারা বললে, বাসনাপুকুর যাবে। একেবারে প'ড়লাম কল্‌বিলয়ার ধারে। বাসনাপুকুর আসতে রাঙা সূর্য্যটা বহুদূর ছিরার পেছনে অস্ত গেল। ওদিকে পূর্ণিমার চাঁদটা

পিছনে চেয়ে দেখলাম, বটেশ্বর নাথের পাহাড় ছাড়িয়ে অনেক ওপরে উঠেছে। কল্‌বিলয়া পার হবার সময় পূবদিকে পাহাড়ের ধূসর ছবি, ওপরে ওঠা পূর্ণচন্দ্রের দিকে চেয়ে চেয়ে বাড়ীর ভিটের কথা ভাবছিলাম—সেই ভাষা কলসী হাঁড়ি প'ড়ে আছে—কোন্‌কালে এই সজিনা ফুলভরা বসন্ত দিনের বার্ত্তা। পিসীমার কাছে কাটান সেই সব দূরের দিনগুলো। ছোট্ট এক নোনা গাছের ধারের ওপরের ঘরে কত পূর্ণিমার রাত চ'লে যাওয়া। সামনে ছিরার মধ্যে এখান থেকে এখনও ছ'মাইল এই রাত্রে যেতে হবে। ঘোড়া ছেড়ে চ'লে এসে যখন নাড়াব ইহারে প'ড়েছি তখন খুব জ্যোৎস্না ফুটেছে—বাঁয়ে বলিয়াডির ওপরে কাশবন একটা। আশে পাশে কাশের ছাড়। নির্জ্জন···ধু ধু করছে মাঠ আর কাশবন—কোন দিকে মানুষের সাড়াশব্দ নেই। পরে আন্দাজে ঘোড়া চালিয়ে এসে দেখি সামনে সেই পড়-দেওয়া জলাটা প'ড়েছে। ঘোড়া টপকে পার হ'ল—প্রতিমুহূর্ত্তেই ভয় হচ্ছিল, বুঝি পথ হারাবো। পরে জঙ্গলটা পার হ'য়ে লোধাইটোলার নীচের তলাটার ধারে এসে গমক্ষেতে ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে অনেকক্ষণ জ্যোৎস্না-ভরা জলাটার দিকে চেয়ে রইলাম। চাঁপাপুকুরের পুকুর ঘাটে যাবার ইমাদি-ওয়ালা জমিটুকুতে ওই রকম জ্যোৎস্না প'ড়েছে। দীর্ঘ দীর্ঘ শস্যক্ষেতের মধ্য দিয়ে ঘোড়া ছাড়লাম—যবের শীষে পা লেগে সির্‌ সির্‌ শব্দ হ'চ্ছিল। লোধাইটোলা ছেড়ে ঘোড়া খুব দৌড় করালাম—Ranchmay's Rideএর মত খুব। গম যবের ক্ষেত দিয়ে এঁকে বেঁকে খুব জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে এলাম। কাছারী পৌছালাম সন্ধ্যার একঘণ্টা পরে।

অপূর্ব্ব জ্যোৎস্নার রাত্রি! দাওয়ায় চেয়ার পেতে ব'সে আছি। সামনের কাশবনে জ্যোৎস্না এসে প'ড়ে অপূর্ব্ব দেখাচ্ছে। কাছারীর অনেকে বটেশ্বরনাথে গঙ্গাস্নান করতে গিয়েছে, এখনও ফেরেনি। কত কি পাখী ডাকছে। বিহারের দিক-দিশাহারা মাঠ, তার নির্জ্জনতা, দু'একটা সাথীছাড়া রব, কাশবন, বালিয়াড়ী, অস্ত-সূর্য্যের রাঙা আলো, অপূর্ব্ব জ্যোৎস্না—এই সবের মোহ ক্রমে ক্রমে মাথায় পেয়ে ব'সেছে। বড় আনন্দে দিন আজ কাটল। যাতায়াতে চব্বিশ মাইল ঘোড়া-চড়া হ'ল আজ।

আজ জয়পালটোলার নির্জ্জন ছায়াপথটা বেয়ে আসতে কেবলই মনে হচ্ছিল—দূরে সেই হাটবার, পূবমুখো যাওয়া থেকে বহুদূর জীবনপথে চলেছি। সেই কুলক্ষেতে যাওয়ার দিন, সেই বাঁশবন পোড়ার দিনগুলো—কত কত পিছিয়ে পড়ে গিয়েছে। এই উদাস ঘুঘুর ডাক, রাঙা অস্ত-সূর্য্যের রোদ,এই গতির

বেগ—এ এক সঙ্গীত। অপূর্ব্ব জীবন সঙ্গীতের নব মূর্চ্ছনার মত মাদকতাময়।

॥ ৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২৮ ॥

কয়দিন ধরে ক্রমাগত জঙ্গলের পথে ঘোড়া নিয়ে বেরুই। উপরি উপরি দু'দিন পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম—সেদিন বড় কুণ্ডীটার কাছে গিয়ে পথ হারানোতে রাজু মিত্র পথ দেখিয়ে আনে। আর একদিন লোধাইটোলার রাস্তা না খুঁজে পেয়ে গভীর জঙ্গলের মধ্যে সুঁড়ি পথ বেয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে কালীমণ্ডলের খুবড়ীর কাছে এসে পড়েছিলাম—সে পথ দেখিয়ে আনে।

আজ রামজোতকে সঙ্গে নিয়ে নারায়ণপুরে দামুডীকুণ্ডীর ফসল দেখতে যাই। লছমীপুর ঘাট পর্য্যন্ত গিয়ে সেখনে থেকে গিয়ে গভীর মানুষ সমান উঁচু কাশ-জঙ্গলের মধ্যে সুঁড়ি পথ বেয়ে কুণ্ডীর ধারে যখন এলাম, তখন নির্জ্জন জঙ্গলের মাথায় পূবদিকে একটিমাত্র সন্ধ্যাতারা উঠেছে। ও: কি ঘন নির্জ্জন জঙ্গলটা। শুধু উঁচু বালিয়াড়ী ও কাশের বন। ফিরে আসতে আসতে বেশ লাগল। দু'ধারে মানুষের গতিবিহীন নির্জ্জন কাশ-ঝাউএর বন। শুকনো কাশ-জঙ্গলের গন্ধে ভরপুর, সোঁদা সোঁদা বেশ লাগে। মাথার ওপরে তারা এখানে ওখানে—এখানে ওখানে উঁচু-নীচু ঢিবি, বালিয়াড়ী—অন্ধকার। বিশাল নির্জ্জনতা, যেন চারপাশের জঙ্গলে, আকাশের নক্ষত্র-জগত তার রাজত্ব বিস্তার করছে—Vast wilderness !···তার মধ্যে ঘোড়ায় আমরা দু'টি প্রাণী—ঘোড়াটা পথ দেখতে না পেয়ে টক্কর খাচ্ছে। গভীর জঙ্গলের দিকে কোনো সাড়া নেই, শব্দ নেই—কোনো কোনো জায়গায় জঙ্গল খুব ঘন নয়। চকচকে বালি, এখানে ওখানে বন-ঝাউএর ঝোপ—উঁচু-নীচু পিছনে কাশ-জঙ্গলের মাথায় তারাভরা পূবদিকের আকাশ, সোঁদা সোঁদা কাশবনের গন্ধ।

এই জঙ্গলের জীবন নিয়ে একটা কিছু লিখবো—একটা কঠিন শৌর্যপূর্ণ গতিশীল, ব্রাত্য জীবনের ছবি। এই বন নির্জ্জনতা ঘোড়ায় চড়া পথ হারানো—অন্ধকার—এই নির্জ্জনে জঙ্গলের মধ্যে খুবড়ী বেঁধে থাকা। মাঝে মাঝে যেমন আজ গভীর বনের নির্জ্জনতা ভেদ ক'রে যে সুঁড়ি-পথটা ভিটেটোলার বাথানের দিকে চলে গিয়েছে দেখা গেল, ঐরকম সুঁড়ি-পথ এক বাথান থেকে আর এক বাথানে যাচ্ছে—পথ হারানো, রাত্রের অন্ধকারে জঙ্গলের মধ্যে ঘোড়া ক'রে

ঘোরা, এদেশের লোকের দারিদ্র্য, সরলতা, এই Virile. active life, এই সন্ধ্যায় অন্ধকারে ভরা গভীর বন ঝাউবনের ছবি—এইসব।

দূরে বাংলাদেশে এখন বসন্ত প'ড়ছে। গ্রামে গ্রামে বাতাবী লেবুফুলের সুগন্ধ, সজনেফুল প'ড়ে আছে, আমের বউল, কচিপাতা ওঠা গাছপালা, দক্ষিণ হাওয়া বইছে—কোকিল ডাকতে সুরু ক'রেছে, তার সঙ্গে মনে পড়ে গৃহে গৃহে এই মঙ্গল সন্ধ্যায় শান্তচোখে গৃহ-লক্ষ্মীদের হাতে আনা সন্ধ্যাদীপ···জানালায় ধূপগন্ধ···দেবতার মন্দিরে আরতি।

॥ ১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২৮ ॥

প্রায় একমাস পরে ফিরায় একঘেয়ে কাশ ও বন-ঝাউএর বনের নির্ব্বাসন থেকে, বালি, সবুজ গম যবের ক্ষেত, ঘোড়ায় চড়া লোধাই টোলার খুবত্তী—এসব থেকে আজ ভাগলপুরে এলাম। অনেকদিন পরে ভারি চমৎকার লাগছিল। সব যেন নতুন নতুন। কাল এসেই চণ্ডীবাবুর সঙ্গে বেড়াতে বার হ'লাম—ক্লাব থেকে মাঠে বেড়াতে গেলাম। কমিশনারের বাড়ীর কাছটাতে যখন এসেছি তখন চণ্ডীবাবুর সঙ্গে গল্প করতে করতে মনে হ'ল অনেক কালের কথা—সেই যে সব দিনে বনগ্রাম স্কুল থেকে Homesick হ'য়ে বাড়ী ফিরতাম। ভারতদের বাঁশতলা, কালীদের বাগানের কোণটা, গাবতলাটা আমার কাছে স্বপ্নপুরীর মত লাগত। কালীর সঙ্গে ইছামতীর ধারে বসে মনে হোত, কতদিন পরে আবার এসব সুপরিচিত স্থানে এসেছি। নভেলে এইসব শৈশবকালের স্মৃতিরই পুনরাবৃত্তি করছি মাত্র—কারণ মনের অভিজ্ঞতা, জীবনের অভিজ্ঞতা ছাড়িয়ে কোনো লেখকই যেতে পারেন না—গেলেই সেটা কৃত্রিম, Tour de force হ'য়ে প'ড়বে।

আজ বৈকালে কলেজের ঘাসবনের পথ দিয়ে বেড়াতে গিয়ে প্রথম ফাগুনের গাঢ় স্নিগ্ধ আম্র-বউলের সৌরভে, বাতাবী নেবুফুলের গন্ধে, অপরাহ্নের ছায়ায় কত কথাই মনে আসতে লাগল। কি অপূর্ব্ব জীবন-পুলক। বহুকাল পরে ফিরার কাশবন থেকে এসে এ-কি অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন! চারধারে ঘেঁটুফুল ফুটে আছে, ঝোপে ঝোপে ছায়া নেমে এসেছে—আম্র-বউলের গন্ধে, পাপিয়ার ডাকে বাতাস অবশ। নেবু ফুলের গন্ধে, মনে পড়ে কতকাল আগে কোন কৈশোরের দিনে, স্নিগ্ধ ছায়াভরা বৈকালে যেন গোপলা গয়লার বাড়ীর সামনের চড়কতলার পথটা দিয়ে যাচ্ছি।

যাক, তারপর লাইনের ওপরকার সাঁকোর ওপর গিয়ে বসলাম, মনে হ'ল

এই অপূর্ব্ব শিল্প যাঁর হাতের—এই পৃথিবী পারের নক্ষত্রজগতে হয়তো কত উন্নত বিবর্ত্তনের জীবজগৎ আছে। তিনি তাঁর অপূর্ব্ব শিল্পপ্রতিভা সে সব উন্নততর জগতে না জানি কত অপূর্ব্বভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন! অনন্ত সৌন্দর্য-ভূমি, এই নক্ষত্র-জগৎ—কত এ ধরণের উন্নত বসন্ত, আরও কত অজানা ঋতু বিলাস তার ধূলায় ধূলায়। যুগে যুগে যে সব শিল্পী, কবি এই সৌন্দর্য্যসৃষ্টির গান ক'রে গিয়েছেন—গ্রীকযুগ, রোমকযুগ, রামায়ণ, কালিদাস, শেলি, সেক্সপিয়র, কীট্‌স্ রবীন্দ্রনাথ—এইসব দ্রষ্টাদের কথা ভাবি। ভগবানের সৃষ্টিকে এরা আরও কত মধুময় করেছে! ঐসব জগতে কত উন্নত ধরণের কবি, দ্রষ্টা, ভাবুক আছেন—কে জানে? আমি বেশ কল্পনা করতে পারি, নির্জ্জন জ্যোৎস্নাময়ী, অজানা গ্রহ-জগতে তাঁদের কল্পনার সে অপূর্ব্ব বিলাস।

॥ ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯২৮ ॥

এখানকার এক একটা দিন এক একটা সম্পদ হ'য়ে উঠছে—কলকাতায় এরকম দিন কটা আসে? আমারই বা এর আগে কটা এসেছিল? স্কুল কলেজের রুটিনবাঁধা কাজ বা স্কুল মাষ্টারীর রুটিনবাধা কাজের সময় এসেছিল বটে দিনকতক Leagueএর কাজের সময়। কিন্তু সে ও বড় ভ্রমণশীল, বেদুইনের মত জীবন ছিল বলে সেও ততটা ভাল লাগেনি।

আজকালকার প্রত্যেক দিনটি এক একটা উৎসব দিনের মত সুন্দর! এত সুপ্রচুর অবসর, এত বৈচিত্র্য আর কখনো কি জীবনে পাব?

আজ তিনটার সময় চণ্ডীবাবু এল, তার সঙ্গে বার হ'য়ে গেলাম—প্রস্ফুট আম্র মুকুলের গন্ধ-ভরা বৈকালের বাতাসের মধ্য দিযে বেড়াতে বেড়াতে রোমান ক্যাথোলিক গির্জ্জাটাতে ঢুকলাম। দুধারে বৈকালের ছায়ায় কি সুন্দর গাছগুলো। আমরুল, কামিনীফুল, আমগাছ, দু'চারটা বিলাতী ফুলের গাছ, চিনি না। গঙ্গার ধারে কেমন সুন্দর বাঁশঝাড, গোলাপের বাগান; Priest-এর সঙ্গে ব'সে অনেকক্ষণ ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা হ'ল। রোমান ক্যাথলিক পবিত্র Beautitude সম্বন্ধে আমাকে যা বোঝালেন তা অন্যভাবে আমি নিজের চিন্তার মধ্যে পেয়েছি। মানুষের মধ্যে এমন একটা শক্তি বেড়ে যাবে, যাতে ক'রে সে ভগবানের বিরাট সত্তা সম্পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম ক'রে বিরাটের আনন্দ পাবে। বললেন, Inquisition সম্বন্ধে বিশ্বাস কোরো না—ওটা আমাদের শত্রুদের লেখা, অনেক সত্য আছে বটে কিন্তু অতিরঞ্জনও খুব। বললেন, আমরা Truth সম্বন্ধে Controversi

করি না—দুটো একটা Doctrine যারা বাদ দিয়েছে তাদেরও বাদ দিয়েছি। রাজা বিয়ে করতে চাইলেন (Henry VIII)—সেই জন্যে আমরা ইংলণ্ডের মত দেশকে ছেঁটে বাদ দিলাম। St. Lewis বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট এতদূর এসেছেন, বললেন, আমরা আর দেশে ফিরবো না, মৃত্যু হয়তো এখানেই হবে।

সেখান থেকে বেরিয়ে কলেজের পথে অন্ধকার ঘন আমবনটা দিয়ে রেল লাইনে এসে উঠলাম। জ্যোৎস্না উঠেছে, পাতার ফাঁক দিয়ে জ্যোৎস্না পড়েছে—এই পাশের তালতলায় গত ভাদ্র মাসে কল্পনা করেছিলাম দুর্ব্বার তাল-কুড়ানো শৈশবে তাল প'ড়ে থাকলে গাছতলায় কিরকম আনন্দ হোত। কি অপূর্ব্ব আম্র-বউলের গন্ধ মাখা জ্যোৎস্না রাত্রিটা! সাঁকোটার উপর অনেকক্ষণ ব'সে গল্প ক'রে ষ্টেশনে এলাম। কবিরাজ মহাশয়ের সঙ্গে অনেককাল পরে দেখা—তিনি সংকীর্ত্তন করতে যাচ্ছেন ষ্টেশনের বাসায়। বাজারে একটা সার্ট কিনে গ্রামোফোনের দোকানে রবি ঠাকুরের আবৃত্তি শুনলাম—আজি হ'তে শতবর্ষ পরে। বৃদ্ধ কবিবরের গম্ভীর গলায় উদাত্ত সুর বড় ভাল লাগল। তারপরে চণ্ডীবাবু চ'লে গেল তার বড়ী, আমি আসতে আসতে পথে ভোলাবাবুর সঙ্গে দেখা। ভোলাবাবু দীপবাবুর বাড়ী যাচ্ছেন Electric fittings-এর Canvass করতে। তাকে বললাম, দীপবাবু এখন ব্রীজ খেলতে ব্যস্ত, সকালে না গেলে কি দেখা হবে!

দিনটা বেশ কাটল।

॥ ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯২৮ ॥

সকালে নায়েবের সঙ্গে গেলাম কমলাকুণ্ডু। বেশ ঘোড়া ছুটিয়ে সকালের হাওয়ায় রণচুর ক্ষেতের পাশ দিয়ে দিয়ে গেলাম। কয়েকদিনের জড়তাটা কেটে গেল। ক্ষেতে ক্ষেতে যব পেকেছে। পাকা ফসলের সুগন্ধ চারধার থেকে পাওয়া যাচ্ছে। কখনো আমি ঘোড়া ছোটাই, কখনো নায়েব মহাশয় ঘোড়া ছোটান। ফুলকিয়ার সীমানা ছাড়িয়েই জঙ্গল থেকে একটা বুনো মহিষ বার হ'ল। সেটার মূর্ত্তি দেখেই আমি বললাম, এটা মারতে পারে, ঘোড়া ঘোরান মশাই। খুর দিয়ে মাটি খুঁড়ে সেটা শিং নেড়ে লাল চোখে আমাদের দিকে চাইতে লাগলো। যদি তেড়ে মারতে আসে—দু'জনে ঘোড়া ফিরিয়ে চালিয়ে খানিকটা এসে আবার দাঁড়িয়ে গেলাম। ততক্ষণ মহিষটা চ'লে গিয়েছে। তারপর আমরা ঘোড়া ফিরিয়ে কমলাকুণ্ডু পৌছলাম। খুব রোদ চ'ড়েছে,

কল্‌বলিয়াতে স্নান করতে এলাম। ঠাণ্ডা জলে নাইতে নাইতে ভাবছিলাম—ঐ আমাদের গ্রামের ইছামতী নদী। আমি একটা ছবি বেশ মনে করতে পারি—এই রকম ধুধু বলিয়াড়ী, পাহাড় নয় শান্ত, ছোট, স্নিগ্ধ ইছামতীর দু'পাড় ভ'রে ঝোপে ঝোপে কত বনকুসুম, কত ফুলে ভরা ঘেঁটুবন, গাছপালা, গাঙশালিকের বাসা, সবুজ তৃণাচ্ছাদিত মাঠ। গাঁয়ে গাঁয়ে গ্রামের ঘাট, আকন্দ ফুল। গত পাঁচশত বৎসর ধ'রে কত ফুল ঝ'রে প'ড়ছে—কত পাখী কত বনঝোপ আসছে যাচ্ছে। স্নিগ্ধ পাটা শেওলার গন্ধ বার হয়, জেলেরা জাল ফেলে, ধারে ধারে কত গৃহস্থের বাড়ী। কত হাসিকান্নার মেলা। আজ পাঁচশত বছর ধ'রে কত গৃহস্থ এল, কত হাসিমুখ শিশু প্রথমে মায়ের সঙ্গে নাইতে এল—কত বৎসর পরে বৃদ্ধাবস্থায় তার শ্মশানশয্যা হ'ল ঐ ঠাণ্ডা জলের কিনারাতেই, ঐ বাঁশবনের ঘাটের নীচেই। কত কত মা, কত ছেলে, কত তরুণ তরুণী সময়ের পাষাণবর্ত্ম বেয়ে এসেছে গিয়েছে মহাকালের বীথি পথ বেয়ে। ঐ শান্ত নদীর ধারে ঐ আকন্দ ফুল, ঐ পাটা শেওলা, বনঝোপ, ছাতিমবন।

এদের গল্প লিখবো, নাম হবে ইছামতী।

সন্ধ্যার পর কমলাকুণ্ডু থেকে বেরুলাম। দিব্যি জ্যোৎস্না উঠেছে। বালুর উপর চকচকে জ্যোৎস্না! জয়পালের নৌকাতে পার হ'তে হ'তে বড় ভাল লাগছিল আর ভাবছিলাম—আজ বৃহস্পতিবার, এই জ্যোৎস্নায় আমাদের দেশে দারিঘাটের পুলের কাছ দিয়ে এসময় হাট ক'রে কেউ হয়তো ফিরছে। রাত্তিরে কারা মাছ ধ'রছে—রাজু সিং জালসমেত ধ'রে নিয়ে এল, ছেড়ে দিলাম। তার-পর ফিন্‌কিফোটা জ্যোৎস্না রাত্রে কাশবনের মধ্য দিয়ে আমি ও নায়েব পাশাপাশি ঘোড়া ছুটিয়ে এসে সীমানার কাছে যেখানে ওবেলা মহিষ দেখেছিলাম ওখানে এলাম। মনে হ'ল দূরে আমার বাড়ী। এই জ্যোৎস্না-উঠা সন্ধ্যায় মার সঞ্চিত হাঁড়িকলসীগুলো প'ড়ে আছে জঙ্গলভরা ভিটেতে। মার হাতের সজনে গাছটা এই ফাগুন দিনে জঙ্গলের মধ্যে ফুলে ভর্ত্তি হয়ে উঠছে। কেউ দেখছে না, কেউ ভোগ করছে না। হরি রায়ের জমিটুকু নেবার কথা মা যখন সইমাকে অনুরোধ ক'রেছিলেন, তখন তিনি জানতেন না যে ছেলে তাঁর ঘর-কুনো গেরস্ত গোছের ছাপোষা গেঁয়ো মানুষ হবে না। সে দেশে দেশে বহু দূরে বহু সমাজে পাহাড়ে পর্ব্বতে ঘোড়ায় ষ্টীমারে ট্রেনে—সারা জগতের অধিবাসী হয়ে বেড়াবে। জীবনের যাত্রাপথের সে হবে উৎসাহী উন্মত্ত পথিক—পথের নেশাতেই ভোর।

মা ছিলেন গৃহলক্ষ্মী, ঐ দরিদ্র ঘরে বিবাহ হওয়া পর্য্যন্ত এসে অল্প সাজিয়ে গুজিয়ে চালিয়ে গিয়েছেন। সেই চাল ভাজা—সেই সব। ঘরকন্না সাজাবার বুদ্ধি যেমন মেয়েদের থাকে, তার বেশী তারা কিছু জানে না, বোঝেও না। মাও ছিলেন তেমনি। মা চিরদিন ঐ বাশবনের ঘাটে, তেঁতুলতলায় শান্ত জীবন যাত্রা সঙ্কীর্ণ ছোট গণ্ডীর মধ্যেই কাটিয়ে গিয়েছেন—সে জীবনের বাইরে তিনি অন্য কোনো জীবনের সন্ধানও জানতেন না। তাই তাঁর সজনে গাছ পোঁতা হরি রায়ের জমি নেবার পরামর্শ, বিয়ে না করতে চাওয়ায় সংসার উল্টে গেল এই ভাবে কান্না—যেন সত্যই তাঁর সংসার উল্টেই গেল—তাঁর সংসার—আমার সংসার নয়।

মাথার উপরের নক্ষত্রজগতের দিকে চেয়ে দেখলাম, এই জীবন ঐ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। কত এরকম জ্যোৎস্না রাত্রি, কত এরকম যাওয়া আসা, কত জীবনানন্দ।

যে যাই ভাবুক আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি—শুধু বিশ্বাস বলে নয়—যেন দেখতেও পাই, হাজার হাজার বছর পরে ঐ আমার শৈশব আনন্দভরা ভিটার মত আর কোন দেশে জন্মে অপূর্ব্ব আনন্দভরা শৈশব যাপন ক'রবো—পৃথিবী মায়ের বুকে নতুন হ'য়ে ফিরে আসবো!

সে যাক, দুর্ব্বল-দৃষ্টি লোকে ভাবে আমি হ'য়েছি Theosophist.

জীবন ভোগ করতে হ'লে হৈ হৈ ক'রে কাটিয়ে দিলে ভোগ হয়না—চাই চিন্তা, ধীর চিন্তা। গভীর চিন্তাতে জীবনরহস্যের গভীর অনুভূতি হয়। সেই ছেলেবেলায় এই ফাল্গুনে বেল কুড়ানো, চড়কগাছ খেলা, সেই মা—জেঠীমা, নেড়া ভরত—সে জীবন শেষ হ'য়ে গিয়েছে। সেই চাঁপাপুকুরের ধার, সেই যে কাদের বাড়ী বেড়াতে গেলাম, সেখানেও আজকার মত জ্যোৎস্না উঠেছে—সে জীবনও শেষ হ'য়ে গিয়েছে।

আমায় দূরে যেতে হবে—বহুদূর। তা'হলে ভারী চমৎকার জীবনের উপভোগ হবে। জ্যোৎস্না রাত্রি ফুজিসান পর্ব্বতে, কি প্যারিসের কোনো বুলভারএর ধারে, কি সমুদ্রের উপর জাহাজে, কি ইজিপ্টের লুক্সর, কি কোণারকের মন্দিরের মধ্যে, মিউরিয়া মরুভূমির উপরে—এইসব ভাবি।

॥ ১লা মার্চ্চ, ১৯২৯ ॥

কাল সন্ধ্যার পর ভাবলাম, দোলপূর্ণিমা রাত্রে ঘোড়ায় বেড়াতে হবে। খুব

বেলা গেলে বেরিয়ে রামজোতের বাগানের কাছে যেতেই জ্যোৎস্না উঠে গেল। রামচন্দ্র সিংএর সঙ্গে কথা ক'য়ে বড় কুণ্ডীটার ধার দিয়ে নির্জ্জন কাশ-জঙ্গলের পথে ঘোড়া চালিয়ে দিলাম। খুব জ্যোৎস্না উঠেছে। নির্জ্জন। বহুদূর পর্য্যন্ত কেউ কোথাও নেই। শুধু কাশ-জঙ্গল, আর জলের ধার। লোধাইটোলার জঙ্গল পেরিয়ে জলাটার ওপর বড় সুন্দর জ্যোৎস্না প'ড়েছে—খানিকক্ষণ ঘোড়া ইচ্ছামত ছেড়ে দিয়ে বসে রইলাম। তারপর খুব জোরে ঘোড়া চ'ড়ে ফিরে এলাম।

আজ পূর্ণিমার রাত্রি। সারাদিন ভীষণ পশ্চিমা বাতাস ব'য়েছে—এখনও সমানে বইছে। ধুলো-বালিতে চারধার ভরপুর, পূর্ণিমার জ্যোৎস্না, বালি-ধুলোর পর্দ্দায় ম্লান ক'রে দিয়েছে—ঘোলা ঘোলা জ্যোৎস্না। সামনের ধূ ধূ কাশবনগুলো জ্যোৎস্নায় অদ্ভুত দেখাচ্ছে হাওয়ায় নুয়ে নুয়ে পড়েছে—বহুদূরে জঙ্গলে আগুন লেগেছে, সেদিকের আকাশটা রাঙা হ'য়ে উঠেছে। আর মাঝে মাঝে দাউ দাউ ক'রে লকলকে আগুনের শিখা খুব উঁচু হ'য়ে আকাশটাকে লেহন করতে ছুটছে।

বাংলাদেশের শান্ত দৃশ্যের কাছে এই নির্জ্জন বাত্যাক্ষুব্ধ ধূ ধূ জ্যোৎস্নাভরা মাঠ জঙ্গলের দৃশ্য, ঐ বনের আগুন, এই ধুলোভরা আকাশ কি অদ্ভুত মনে হয়!

॥ ৬ই মার্চ্চ, ১৯২৮ ॥

রামবাবুর ঘোড়াটা চ'ড়ে বড় আরাম পাওয়া গেল। কাল বৈকালে, পরশু রামপুরের মাঠে একেবারে সোজা কদমচালে চ'লে গেল—আজ তেলির সাক্ষী দিতে নওগাছিয়া হ'য়ে এলাম—কি সুন্দর। লছমীপুরের ধাপাটার কাছে এসে দেখি রূপলাল সবে ধাপটা পার হচ্ছে, লোকারা চামার মোট নিয়ে পিছনে। ঘোড়াটা হু হু করে উঁচু পাড়টার ওপর ওঠে গেল—কি সুন্দর কদমই ধরলে! এরকম ঘোড়া চড়া কখনো হয়নি, এ কয়দিন বেশ হ'ল। নওগাছিয়া ইঁদারার কাছে ঘোড়া জল খেলে—তারপর একেবারে রামবাবুদের গোলা। তারপরে ভাগলপুরে এসেই চণ্ডী বাবুদের বাড়ী এলাম। অনাদিবাবুর সঙ্গে গল্প করলাম—সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছে। মনে হ'ল সেই পাশের পথটা—পিসিমা জল নিয়ে প্রথম এল—আমি বাবার সঙ্গে কলকাতা থেকে সেই প্রথম এলাম···দেখতে দেখতে কতকাল হ'ল!

Goethe-এরও কথাটা ভাল লাগে—Those who cannot hope

about a future life are already dead in this life. সন্ধ্যাবেলা অনিল বাবু উকিলের সঙ্গে মুকুন্দ দাসের যাত্রা শোনা গেল।

॥ ১৪ই মার্চ, ১৯২৮ ॥

আজ ভণ্ড সিংএর জাহাজে বিকালের দিকে ভাগলপুর থেকে বেরিয়ে সন্ধ্যার পূর্ব্বে এলাম মহাদেবপুর ঘাট। মেঘান্ধকার সন্ধ্যা—মুকুন্দ, মাগব, পুরণ, ছট্টু সিং এবং সিপঙ্গী ও রূপলাল—এই কয়জন সঙ্গে অন্ধকারের মধ্যে ঘোড়া চালিয়ে আসতে সাহস না পেয়ে আস্তে আস্তে এলাম। বালির চরে আসতে না আসতে অন্ধকার হয়ে গেল—বাঁ-ধারে পর্ব্বতার জঙ্গলে আগুন জ্বলছে। গঙ্গার ঘড়িয়াল-গুলো আমাদের পায়ের শব্দে হুড়ুম হুড়ুম ক'রে জলে নেমে গেল। আমি নেমে হেঁটে চললাম। মুকুন্দকে বললাম, গল্প বল—সে গল্প আরম্ভ করে দিলে। খানিকটা এসে দিকভ্রম লাগল বালির চরে ওপরে। এত ঘন অন্ধকার যে, ছু'হাত তফাতের মানুষ দেখা যায় না—আমার বড় লণ্ঠনটা জ্বেলে নিয়ে তবু অনেকটা সুবিধে হ'ল। মুকুন্দ বললে, রাক্ষসের আলো জ্বলছে—এদেশে আলেয়াকে রাক্ষসের আলো বলে। কত ভূতের গল্প হ'ল।

'দেবতার ব্যথায়' এইরকম লিখতে হবে যে, কোনো উন্নততর গ্রহের জীবেরা অসীম-শূন্য বেয়ে দূর গ্রহের উদ্দেশে যাত্রা ক'রে—পথও হারিয়ে যায়। অসীম শূন্য বেয়ে, অসীম অন্ধকারে তাদের যাত্রা, দুর্জ্জয় সাহসী Pioneers !

॥ ১৫ই মার্চ, ১৯২৮ ॥

আজ বিকালে ঘোড়া ক'রে পরশুরামপুর কাছারী এলাম। কুলিরা আগেই রওনা হ'য়ে গিয়েছিল। মুনেশ্বর ধ'রে-বেঁধে একজন কুলিকে শেষে জোগাড় ক'রে তাকে দিয়ে টেবিল চেয়ার পাঠালে। আমি একটু বেলা গেলেই রওনা হলাম। কাল Imperial Library থেকে Conradএর বইখানা পাঠিয়ে দিয়েছে—আজ সেইটা পড়ছিলাম। আজকাল ইসমাইলপুর কাছারীটা বড় সুন্দর লাগে। দুবলীঘাসের ফুল, কণ্টিকারীর বেগুনী ফুল, বনমুলোর ফুল, আকন্দের ফুল। বৈকালে আজ বেড়াতে গেলাম, ক্ষেতে ক্ষেতে পাকা শস্যের গন্ধ, কাটুনি মজুরেরা ফসল কাটছে। কাছারীর ওপর দিয়ে ছু'বেলা মেয়েমানুষেরা যাচ্ছে—সকালটা বেশ লাগে। কি অদ্ভুত দুপুরটা—দুপুর রোদে ঝাউ ও ঝাশবন যেন কোন রহস্যের গভীর মায়া, যবনিকায় ঢাকা থাকে। কত অসম্ভব আর আজগুবি

চিন্তা মনে নিয়ে এসে ফেলে। বিহারের ঐ সুদূর প্রসারী প্রান্তর, দূরের রৌদ্রে ধোঁয়া ধোঁয়া অস্পষ্ট নীল পাহাড় দুটো—পীরপৈঁতির পাহাড়শ্রেণী, দিলবরের খুবড়ীর পিছন দিয়ে, রামবাবুদের বাসার পিছন দিয়ে একবারে এতমাদপুরের কাছারীর দিকে বিস্তৃত থাকে। বড় মৌন, রহস্যময় মনে হয় এই খর-রৌদ্র-প্লাবিত চৈত্র-দুপুর।

আসতে আসতে রণপাল মণ্ডলের ক্ষেতের কাছে জঙ্গলটার সামনেই দেখলাম জমাদার আসছে পরশুরামপুর থেকে—বললে, কুলীরা সব পৌঁছে গিয়েছে। জঙ্গলটার কি সোঁদা সোঁদা গন্ধ! বার হ'য়েই লোধইটোলার ধাপটার ওপারে উন্মুক্ত প্রান্তর, দূরের পাহাড়, হু হু উন্মুক্ত হাওয়া, আবার সেই পাকা ফসলের গন্ধ—আঃ এই জীবন। ভাবছিলাম সেই কত দিন আগে পিসিমা এল, ঠাকুরমা-দের পাশের পথটা দিয়ে—আমিও বাবা এসেছি মামার বাড়ী থেকে, পিসিমা কঞ্চিঘাটে—সেই সব দিনগুলো। নেড়ার বাবা এখনও কলিডাঙ্গা লাভবড়পুর ক'রে বেড়াচ্ছে—আর আমাদের বাংলার গাছে গাছে ফুল ফুটেছে। কচিপাতা গজিয়েছে, কোকিল ডাকছে, কাঞ্চনফুল গাছ আলো ক'রেছে···অবসন্ন গ্রীষ্মবেলায় ঝোপে ঝোপে সুমিষ্ট বনফুলের বাস—বেলের পাতা—চড়কের ঢাক—গোষ্ঠবিহার—কোকিলের কুহু, পাপিয়ার মন-মাতানো সুর, রামনবমী।

অন্ধকার হবার সঙ্গে সঙ্গে বালিতে পড়লাম—রাজু সিং এপারেই দাঁড়িয়েছিল—জল পার ক'রে ঘোড়া নিয়ে গেল। ডুবে এসে অনেক দুঃখ করতে লাগল যে, সে তার মেয়ের বিয়ে জমাদারের সঙ্গে দেবে না, তবুও কেন নায়েব তার জন্যে পীড়াপীড়ি করছে।

॥ ২০শে মার্চ, ১৯২৮ ॥

পরশুরামপুর কাছারীতে অনেকদিন পরে বাস করছি। সেই প্রথম ভাগল-পুরে এসে হেমন্তবাবুর আমলে কিছুদিন ছিলাম বটে, তারপর সেই একবার এসে বস্তির মধ্যে ঘরটায় ছিলাম। অনেকদিন পরে এখানে কিছুদিনের জন্যে বাস করতে এসে বড় ভাল লাগছে। আজ সকালে উঠে দেখি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, বড় মন খারপ হ'য়ে গেল—কিন্তু একটু বেলা হলেই মেঘটুকু কেটে খুব কড়া রোদ উঠল। গয়ম ও গৈফুর তহশীলদারের সঙ্গে গঙ্গায় স্নান করতে গিয়ে স্নিগ্ধ গভীর শীতল জলে অবগাহন স্নান ক'রে বড় আরাম পেলাম বহুদিন পরে। স্নান করতে কেবলই মনে হচ্ছিল, আমাদের গাঁয়ের ইছামতীর ঘাট থেকে এই

স্নান স্নিগ্ধ চৈত্র-দুপুরে কচিপাতা ওঠা বন-ঝোপের পাশ কাটিয়ে বাঁশবনের ছায়ায় কোকিলের ডাক শুনতে শুনতে ফিরে আসা। বালি বড় তেতে গরম হ'য়েছে—পা পুড়ে যাচ্ছে। রাখালবাবু মারা গিয়েছেন শুনে বৈকালে ঘোড়া নিয়ে তাঁর বাড়ী তিনটাঙাতে দেখতে গেলাম। জয়পাল সাধুর বাড়ীর কাছে গিয়ে একজন স্ত্রীলোককে জিজ্ঞাসা করলাম—ডাক্তারবাবুর বাড়ী কোথায়? সে কথা বললে না। তারপর একটা লোককে জিজ্ঞাসা করাতে সে রাস্তা বলে দিলে। এর ওর বাড়ীর সামনে দিয়ে একটা বাড়ীর কাছে এলে, একটা ফর্সামত ছেলে বললে, ডাক্তারবাবুর বাড়ীতে কেউ নেই। সেখানে দেখি, মটুকনাথ পণ্ডিত কি করছে। সেই মটুকনাথ—যে তৌজিরদিন কাছারী গিয়ে কানের পোকা বার করবার যোগাড় করেছিল। ফিরলাম যখন বেলা প'ড়ে গিয়েছে। বহুদিন দিয়ারায় থাকবার সময় চোখে যখন হঠাৎ এই বড় বড় বট অশ্বত্থগাছ দেখি তখন একঘেয়ে কাশ-ঝাউবনের দৃশ্যের সঙ্গে তুলনায় মনে হয়, যেন কোন্ অঙ্গার-যুগের পৃথিবী থেকে হঠাৎ উচ্চ বিবর্ত্তনের জগতে এসে পৌঁছেছি।

স্নিগ্ধ বৈকাল। ঝোপে ঝোপে পাখী কিচ্ কিচ্ করছে, আলোকলতা দুলছে। আস্তে আস্তে ঘোড়া চালিয়ে এসে পথের ধারে একটা রোদপোড়া ঘাসেভরা মাঠ পেলাম—বড় ভাল লাগল। মাঠের একটা বড় অশ্বত্থ গাছে নতুন কচি রক্তাভ পাতা গজিয়েছে। অনেক শকুনির বাসা—মাঠে ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম। এই স্নিগ্ধ বৈকালে আমাদের ইছামতীর ঘাটের পথ বেয়ে গ্রামের মেয়েরা সব গা ধুয়ে আসছে। যারা ছিল বিশ বছর পূর্ব্বে নব-বধূ তারা আজ প্রৌঢ়া, জীবনের কত সুখ-দুঃখের ওলট-পালট হ'য়ে গিয়েছে। সেই কুলগাছ দেখে এসে বাঁশতলায় বসা—পিসিমার সেই কঞ্চিকাটা বাঁশবন, যার হাতের হাঁড়ী কলসী পোড়ো ভিটায় পড়া—যার হাতের পোতা সজনেগাছ—এই স্নিগ্ধ বৈকালে কচিপাতা ওঠা অদ্ভুত ধরনের আঁকাবাঁকা গাছটার সীমারেখার দিকে চেয়ে মন-মাতানো কোকিল, পাপিয়ার উদাস ডাক শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল জীবনটা কি অপূর্ব্ব করুণ সঙ্গীত। সন্ধ্যায় পূরবী গৌরী রাগিণীর মত নির্লিপ্ত নির্ব্বিকার, অথচ চারু-শিল্পের চরম দান। বিহারের এই ধূ ধূ উদাস মাঠ প্রান্তর, দূরপ্রসারী দিক্চক্রবাল, দু'একটি পুরোনো শিমুলগাছ—রক্ত সূর্য্যাস্ত বড় ভাল লাগে। দূরের নীল পাহাড়টা—যেন এক মায়া, রাজ্যের সীমা এঁকেছে সন্ধ্যাধূসর পূর্ব্ব আকাশপটে। সারাদিনের খররৌদ্রদগ্ধ মাটীর সোঁদা সোঁদা রোদপোড়া গন্ধ, তারপরেই কলবলিয়ার ঠাণ্ডা জলের গন্ধ—বড় আনন্দ পেলাম আজ।

এখানকার জলের গুণ বড় ভাল দেখছি।

দুপুরবেলা কমলাকুণ্ডুর কাছারীতে বসে বসে লিখি—খর-প্রচণ্ড চৈত্র-রৌদ্র—পাশের ঘর যেন আগুনের মত দাউ দাউ জ্বলে—হু-হু পশ্চিমে হাওয়া বয়, আমার খোলা দরজার ঠিক সামনে দূরের ঐ কচিপাতা ওঠা শিশুগাছটির দিকে ও তার পেছনকার উটের পিঠের কুঁজের মত ধূসর পাহাড়টার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখি—কেবল মনে পড়ে, এই মধ্যাহ্নে বাংলাদেশের কত অজানা মাঠ—ঘেঁটুফুলে ভরা, উলুখড়ে ভরা, কত মোটা মোটা গুলঞ্চলতা-দুলানো, রাঙাফুলের ভরা শিমুলগাছ। এগাছের ওগাছের তলায় যেন বসলাম। অজানা গ্রাম্যপথে মাঠের ধারের বনে গাছপালায় স্নিগ্ধ ছায়ায় ব'সতে ব'সতে পথহাঁটা রেলপথ থেকে বহু-বহুদূর সব গ্রাম—কত দরিদ্র পল্লীতে শান্ত নিভৃত জীবনযাত্রা। কত ঘরে কত সুখ-দুঃখ—কত বধূ কত কন্যার শান্ত চোখ।

॥ ২১শে মার্চ্চ, ১৯২৮ ॥

আজকার বেড়ানোটা-সবচেয়ে অপূর্ব্ব। কলবলিয়া পার হ'য়ে মকুন্দপুরের পথে বেড়াতে গেলাম। বেলা একেবারে গিয়েছে। বাঁ ধারে কলবলিয়ার ওপারে সিমানিপুরের দ্বিরাতে সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে। কমলাকুণ্ডু পার হ'য়েই পথের ধারে বড় বড় শিমুল পাকুড়গাছ, ঘেঁটুফুলের তেঁতো গন্ধ—বাঁশঝাড়, কোকিলের ডাক, গ্রামসীমার গাছপালায় মধ্যে পাপিয়া ডাকছে। বসন্তের দিনে বেশ লাগল। অজানাপথে আকন্দফল, কচি ওড়াফুলের মধ্যে দিয়ে ঘোড়া চালিয়ে যেতে এমন লাগছিল! যেতে যেতে একটা গ্রাম প'ড়লো—লাবটুলিয়া, পরে বোচাহি। পথে কীর্ত্তনিয়া বৃন্দাবন হেঁটে আসছে—বললে, নাগরা গিয়েছিল কীর্ত্তন করতে। আমি বললাম—রামবাবুর ওখানে? তারপর সে চ'লে গেল। ক্রমে ডিমুহী পেলাম। চৌধুরীটোলা। সেইখানটা গিয়ে পথের ডানধারে একটা সরু মাটির পথ—দু'ধারে ঘন শিশুগাছের শ্রেণী—ছায়াভরা মাটির গন্ধ। রাস্তা ছেড়ে দিয়ে সেই পথ ধরলাম। একটু দূরে গিয়ে একটা পোড়ো ভিটামত—ঘেঁটুফুলের একেবারে জঙ্গল। ঘেঁটুফুলের গন্ধে একেবারে ভরপুর। ওদিকে আর একটা বাঁশঝাড়, একটা পাড়া। সেইখানটা গিয়ে মনে প'ড়ল অনেকদিন আগে সেই যে গিয়েছিলাম বাগান-গাঁয়ে রাখালী পিসিমার বাড়ী গিয়ে, ওদিকে কোদ্‌লার ধারে একটা পুরোনো ভিটাতে—সেই কথা মনে প'ড়ল। ঠিক যেন সেই স্থানটা—এ স্থানটা ঠিক যেন বাংলাদেশ! বিহারে এতদিন পরে বাংলার সাদৃশ্য খুঁজে

পেলাম। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম—কোন্ বিদেশে আছি—আজ আমার দেশে বৃহস্পতিবারের হাট, পঞ্চাননতলা দিয়ে মনো শ্যামাচরণ দাদা ফণীকাকা হাট ক'রে ফিরছে—কেউ জিজ্ঞাসা করছে—আজ বেগুনের সের কত? তুমি বুঝি এখন হাট থেকে এলে? আমার মায়ের হাতে পোঁতা সজনেগাছ—ভাঙা-কলসী—হরি রায়ের বিষয়—

সে সব থেকে কতদূরে বিদেশে ঘোড়া করে বেড়াচ্চি—অজানা গ্রামের পথে পথে, অজানা ঘেঁটুফলের ঝোপের ধারে ধারে—আমার কি সাজে কলকাতার আফিসে ব'সে বদ্ধ হাওয়ার কাজ? আমার জন্যে এই আকাশ ওই সূর্য্যাস্ত ওই নদী ওই মুক্ত হাওয়া, স্বাধীনতা—অপূর্ব্ব অপরাহ্ন! ডেস্কে ব'সে শুধু লেখার কাজ আমার নয়!

॥ ২২শে মার্চ্চ, ১৯২৮ ॥

কাল বৈকালে পরশুরামপুরে ঝিরার লাচটুলিয়ার এপারে খুব দাঙ্গা হ'য়ে গেল। দাঙ্গার হৈ হৈ শব্দ কাছারী থেকে শোনা যাচ্ছিল। নারায়ণকে ঘোড়া দিয়ে পাঠান হ'ল। খুব ঘোড়া ছুটিয়ে গিয়ে খবর দিলে—আজ সকালে আমি ও মুটু ঘোড়া ক'রে জঙ্গলের পথে ইসমাইলপুর চ'লে এলাম। পাচটার সময় ঘুম থেকে উঠে চেয়ার নিয়ে বারান্দাটাতে বসলাম। দূরে নীল পাহাড়টার দিকে চেয়ে মনে হ'ল, সুন্দর ইছামতী—আমাদের গ্রাম—এই বৈশাখের সুগন্ধভরা প্রভাত, অপরাহ্ন, সেই আম জাম তলা, মাঠ, নদী—ঠাকুরমাদের বেলতলাটা—বেলফুলের গন্ধ—কতদিনের কত আনন্দ!

খুব জ্যোৎস্না—বড় সুন্দর লাগল।

॥ ২৮শে মার্চ্চ, ১৯২৮ ॥

পরশু গেল রামনবমী। বসে বসে ভাবছিলাম এই দুপুরে এতক্ষণ পা ছড়িয়ে বালির ওপর দিয়ে সব খেতে চলেছে কারা? রাখাল রায়, হরিশ বাঁড়ুয্যে, বাবা এঁরা নন। তাঁদের পৌত্রের দলেরাই বেশী। সন্ধ্যার সময় বাদা ময়রার দোকান খুলবে—এই জ্যোৎস্নায়। জীবনটা একটা অবাস্তব রূপকথার কাহিনীর মত মধুর ও রহস্যময় ঠেকে।

তারাভরা আকাশের দিকে চাইলে সেই চাঁপাপুকুরের নিমন্ত্রণ খাওয়ার বাড়ী, আড়ংঘাটার ঠাকুরবাড়ীর ছাদ মনে হয়। সমুদয় আকাশ, তারাগুলো অপূর্ব্ব

রহস্য-ঘেরা মনে হয়। কাল গেল '১লা এপ্রিল'। সেই "১লা এপ্রিলের শান্তোজ্জ্বল উষালোকে" ছেলেবেলাকার কথা। কাল মুটু চ'লে গেল এখান থেকে। বড় পশ্চিমে বাতাসটা দিয়েছে কাল।

॥ ২রা এপ্রিল, ১৯২৮॥

আজ গুডফ্রাইডে। অনেককাল আগে মনে পড়ে এইদিন বনগাঁ স্কুল থেকে সন্ধ্যেবেলা আমি আর ভরত বাড়ী চ'লে এসেছিলাম। সেইটাতেই যেন ভরত মারা গেল। কতকালের কথা সে সব, তবু মনে হয় সেদিন। তারপর ক'ত গুডফ্রাইডে কেটে গেল। কালের চক্রটা ভয়ানক বেগে ঘুরে চলছে।

এইমাত্র হঠাৎ বড় ঝড় এল। আমি আর গোষ্ঠবাবু আমার ঘরের সামনে বসে আছি—এমন সময় দেখা গেল উত্তর-পশ্চিম কোণে ঘন কালো মেঘের পাড়। হাওয়াটা যেন একটু জোর—এমন কি আমরা বলছিলাম বেশ হাওয়া তো? দেখতে দেখতে মেঘের পাড়টা গুমরে উঠলো—তার পরই হু হু ক'রে ঝড়টা এল—সঙ্গে সঙ্গে ধুলো ও দ্বিরার বালির চরের সমস্ত বালি উড়ে আসতে লাগল—কমে না—এক এক দমকায় আমার ঘরখানাতো কাঁপতে লাগল।

॥ ৬ই এপ্রিল, ১৯২৮॥

আজ খুব বর্ষা ঘনিয়ে এল ভাগলপুরের দিক থেকে বিকেলটাতে। ছেলে—বেলাকার মত কালবৈশাখী যেন। ঘন-কালো মেঘটা ঘুরে গঙ্গার দিক থেকে পৈতির পাহাড়ের দিকে ছড়িয়ে প'ড়তে লাগল। কালকের সকালে যে চারধারে পরিখায় বাদামে পাহাড় দেখা যাচ্ছিল—বংশী, জামালপুর—সব ঢেকে দিলে।

ঘনান্ধকার আকাশের দিকে চেয়ে মনে হ'ল এই তো জীবনের সম্পদ—হয়তো তিন হাজার বছর পরে আবার পৃথিবীর বুকে আসবো—তিন হাজার বছর আগের ষাট বৎসরের প্রতিদিন কি অবদানে, সুষমায়, স্মৃতিতে মণ্ডিত হ'য়ে গিয়েছিল—কত কালবৈশাখীর মেঘে, কত চোখের হাসিতে, চাঁপাফলের গন্ধে, কত দুঃখে, কত গানে—সে সব তখন কি মনে থাকবে? এই একটা একটা দিন জীবনের মণিহারে গাঁথা অপূর্ব্ব সম্পদ—প্রতিদিনের হাসিকান্না, সুখ-দুঃখ, বন্ধুতা—সব। দূরে হয়তো মায়ের হাতে পোঁতা সজনেগাছে এতদিনে বনের মধ্যে ডাঁটা ধরে আছে—কে জানে? হয়তো কেউ তুলে নিয়ে গিয়েছে—নয়তো নয়। গতির অপূর্ব্ব বিচিত্রতা আমি লক্ষ্য করছি—সে আমার চোখে প'ড়েছে।

বসে আছি—কিন্তু কি বিশালবেগে চলেছি।

॥ ৯ই এপ্রিল, ১৯২৮॥

কাল থেকে কি একরকম অজানা খুসিতে মন থেকে থেকে ভরে উঠছে—ওই দূরের নীল পাহাড়টার পাশের দিকে চেয়ে থাকলেই সে আনন্দটা পাই। কাল তাই ভাবছিলাম, হে বিশ্বদেব. কি অপূর্ব্ব-কাণ্ড সৃষ্টিই করেছ এই মানুষের জীবনে, এই বিশ্বে!

আজ সকালে উঠে গেলাম গঙ্গাস্নান করতে। ফিরে এসে কালীঘরে কলসী উৎসর্গ ক'রে ভারী তৃপ্তি পাওয়া গেল। শ্যোরমারী থেকে সিদ্ধেশ্বর নাপিতকে রামচরিত ডেকে আনলে, কারণ মোহনের অসুখ ক'রেছে তারপর খাওয়ার পর একটু ঘুমানো গেল। বড গরমটা প'ড়ে গিয়েছে।

দুপুরে রেড়িক্ষেতের কাছটা থেকে ফিরে আসতে হঠাৎ মনে হ'ল, আজ চড়ক, তিরিশে চৈত্র। অমনি সারা গাটা যেন শিউরে উঠল—শত-স্মৃতির দ্বার এক ঝাপটা হাওয়ায় খুলে গেল! দুপুরের খর-রৌদ্রভরা আকাশের তলায় হলুদরংএর বনমুলার ফুল, আকন্দফুল, বেগুনী-কণ্টিকারী ফুল পোড়ো জমিটাতে অজস্র ফুটে অনন্তের সন্ধান এনেছে—আমার খড়ের বাংলা-ঘরের পিছনে। ঐখানটায় দাঁড়িয়ে দূরের নীল পাহাড়গুলোর দিকে চেয়ে মনে প'ড়ল, এতক্ষণ আমাদের চড়কতলায় হযতো দোকান-পসার ব'সে গিয়েছে—হয়তো সেই গাছটার ছেলেবেলার মত কাঁটা ভাঙছে—কাল গিয়েছে নীলের দিন। হয়তো গাঁয়ে যাত্রা হবে—হয়তো কত আনন্দ হচ্ছে—পুরোনো দলের কেউ কাঁটা ভাঙছে না। নতুল দলের ছেলেপিলেরা, শ'ত জেলে এখনও বেঁচে আছে।

আমাদের বাড়ীর ভিটেটাতে নতুন পোঁতা প'ড়ে আছে, কতকাল আগের এক নব-বর্ষের জলদানের চিহ্ন—দাতা হয়তো বেঁচে নাই। কত যত্নে তোলা ছিল—সেই সজ্‌নে গাছটার মত, কত যত্নে সঞ্চয় করা। সামনের বাঁশতলার ভিটেটাতে যে-সব খোলা-খাপরা প'ড়ে আছে, কতকাল আগেকার কোন বিস্মৃত নব-বর্ষের ঘটদানের ভাঙা কলসীর খোলা-খাপরা সে-সব? ভাবতেও—এইকালের অনন্ত-প্রবাহের চিন্তা করেই গা কেমন শিউরে ওঠে!

সৃষ্টি আছে, চন্দ্র আছে, অসীম বস্তুপিণ্ডগুলো আছে—কিন্তু মানুষ যদি না থাকতো, তবে কিছু না। মানুষ আছে ব'লেই এই সৃষ্টীর শ্রেষ্ঠত্ব, সুখের-দুঃখের আনন্দ-উৎস। অজানা গ্রহে নক্ষত্রে কি আছে জানি না, কিন্তু মনে হয় সে-সব

স্থান মরুভূমি নয়—তরুণ-মুখের হাসি-কান্নায়, সে-সব অজানা দূরের জগতও জাগ্রত প্রাণ-স্পন্দনে ভরা. সেখানেও বিচিত্র সন্ধ্যাকাশে বিচিত্র বনপর্ব্বতের নির্জ্জনতায় বিরহী একা বসে প্রিয়ার কথা ভাবে, মা হারানো ছেলের স্মৃতিতে চোখের জল ফেলেন, দেশকর্ত্তারা বড় বড় কাজ করেন, বড় বড় যুদ্ধ বিগ্রহ হয়!

এই পৃথিবীতে এই মনুষ্যের মনের সুখ-দুঃখ নিয়েই ভগবানের অপূর্ব্ব কাব্য। এর সঙ্গে জীব-জন্তুর, গাছপালার দুঃখ তাঁর মনে আসে যদি. তবে তাঁর আনন্দের তুলনা কোথায়?

॥ ১৩ই এপ্রিল, ১৯২৮। ৩০শে চৈত্র, ১৩৩৭ ॥

নব-বর্ষের প্রথম দিনটা।

অনেককাল আগের শৈশবের সেই-সব কালবৈশাখীর দিনের কথা মনে পড়ে। সেই বৃষ্টির গন্ধ, মেঘান্ধকার! আকাশের মায়ায় মুগ্ধ হ'য়ে ঘরের কোণে বসা, কাঁথা পাতা, শিল-পড়ার আশায় আগ্রহে আকাশের দিকে ঘন-ঘন চাওয়া, ঘরের দাওয়ায় চেয়ার পেতে মেঘান্ধকার আকাশের দূর পূর্ব্বপ্রান্তে চেয়ে বিদ্যুৎ-চমক—বৃষ্টির গন্ধ উপভোগ করতে করতে মনে পড়ল কত কথা। অনেকদূরে আজ আমার গ্রামে হয়তো চড়কের গোষ্ঠবিহার, ছেলেবেলার মত মেলা হচ্ছে. কত হাসিমুখ ছেলেমেয়ে, পাড়াগাঁয়ের কত মাটির ঘর থেকে এসেছে—এতক্ষণ লাঠিখেলা চলেছে—পঁচিশ বৎসর আগের মত হয়তো। পঁচিশ বৎসর আগের সে বালকের কথা মনে হয়, যার মনে কালবৈশাখীর অপূর্ব্ব বার্ত্তা আনতো!

ত্রিশ পঞ্চাশ একশো হাজার তিন হাজার বছর কেটে যাবে। তিন হাজার বছর পরেকার সে বাংলার ছবি আমি এই মেঘান্ধকার নির্জ্জন সন্ধ্যাটিতে বাংলা থেকে দূরের দেশে এক জঙ্গল—পাহাড়ের ধারের ঘরটিতে ব'সে মনে আনতে চেষ্টা করি। হয়তো সম্পূর্ণ নতুন ধরনের সভ্যতা. যার বিষয় আমরা কল্পনা করতেও সাহস পাই না, সম্পূর্ণ নতুন ধরনের রাজনৈতিক অবস্থা তখন জগতে এসেছে। হয়তো ইংরেজ-জাতির কথা. প্রাচীন গ্রীক রোমানদের মত ইতিহাসের গল্পের বিষয়ীভূত হয়ে দাঁড়িয়েছে। রেল ষ্টীমার এরোপ্লেন টেলিগ্রাফ তখন প্রাচীন যুগের মানব-সভ্যতার কৌতূহলপ্রদ নিদর্শন-স্বরূপ—সে ভবিষ্যৎযুগের মানবের চিত্রশালিকায় রক্ষিত হচ্ছে। বর্ত্তমান বাংলাভাষা, তখন আর কেউ বুঝতে পারবে না, হয়তো এ ভাষা একেবারে লুপ্ত হ'য়ে গিয়ে এর স্থানে সম্পূর্ণ নতুন এক ধরনের ভাষা প্রচলিত হ'য়েছে। বহুদূর ভবিষ্যতের ছবি!

তখনও এই রকম কালবৈশাখী নামবে, এই রকম মেঘান্ধকার আকাশ নিয়ে, ভিজে মাটীর গন্ধ নিয়ে, ঝড় নিয়ে, বৃষ্টির শীকরসিক্ত ঠাণ্ডা জোলো হাওয়া নিয়ে, তীক্ষ্ণ বিদ্যুৎ চমক নিয়ে—তিন হাজার বছর পরের বৈশাখ-অপরাহ্নের উপর।

তখন কি কেউ ভাববে তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বের প্রাচীন যুগের এক বিস্মৃত কালবৈশাখীর সন্ধ্যায় এক বিস্মৃত গ্রাম্য বালকের ক্ষুদ্র জগৎটি এই রকম বৃষ্টির গন্ধে, ঝোড়ো হাওয়ায় কি অপূর্ব্ব আনন্দে দুলে উঠতো? এই মেঘান্ধকার আকাশের বিদ্যুৎচমক—সকলের চেয়ে এই বৃষ্টির ভিজে সোঁদা সোঁদা গন্ধটা কি আশা উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা দূর দেশের, দূরের উত্তাল মহাসমুদ্রের, ঘটনাবহুল অস্থির জীবনযাত্রার কি মায়া-ছবি তার শৈশব-মনে ফুটিয়ে তুলতো?

কোথায় লেখা থাকবে তার তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বের এক বিস্মৃত অতীতের সে সব আনন্দভরা জীবনযাত্রা, বহুদিন পরে বাড়ী ফিরে মায়ের হাতে বেলের পানা খাওয়ার মধুময় চৈত্র অপরাহ্নটি, বাঁশবনের ছায়ায় অপরাহ্নের নিদ্রা ভেঙে পাপিয়ার যে মন মাতানো ডাক—গ্রাম্য নদীটির ধারে শ্যাম তৃণদলের উপর ব'সে ব'সে কত গান গাওয়া, কত আনন্দ-কল্পনা, এক বৈশাখের রাত্রিতে প্রথম বর্ষণসিক্ত ধরণীর সেই মৃদু সুগন্ধ যা তার নববিবাহিতা তরুণী পত্নীর সঙ্গে সে উপভোগ করেছিল? কোথায় লেখা থাকবে বর্ষাদিনের বৃষ্টিসিক্ত রাত্রিগুলোর সে সব আনন্দকাহিনী?

দূর ভবিষ্যতের যে সব তরুণ বালক-বালিকার মনে এই কালবৈশাখী নব আনন্দের বার্ত্তা আনবে, কোন্ পথে তারা অসেবে?

এই সন্ধ্যায় ব'সে গভীর ভাবে একথাগুলো ভাবতে ভাবতে কোন গভীরের মধ্যে ডুবে গেলাম! মেঘভরা নির্জ্জন সন্ধ্যা—বিদ্যুৎচমক—ঝড়ের শব্দ—হঠাৎ এই জলের গন্ধে এক অপূর্ব্ব বার্ত্তার আনন্দে মন শিউরে উঠলো।

এই ঘন মেঘের পরপারে কোথায় যেন আছে অনন্ত প্রাণধারার উৎস, দিকে দিকে যুগে যুগে প্রবাহমান জীবনের উৎসব, নিত্য শাশ্বত আনন্দলীলা ও অনন্তের গভীর রহস্য, বিশালতা···আর যা আছে তাদের বর্ণনা মানুষের ভাষায় নেই—কোনো ভাষার ব্যাকরণে তার প্রতিশব্দ গ'ড়তে পারেনি। 'অনন্ত' 'শাশ্বত' 'নিত্য' 'বিরাট' প্রভৃতি মামুলি একঘেয়ে কথায় তার বর্ণনা শেষ হ'য়ে যায় না, বোঝানো যায় না প্রকৃতরূপ—যে শুধু এই কালবৈশাখীর বৃষ্টির গন্ধ মিশানো দূর হাওয়ায়, ঘন মেঘের মধ্যে বিদ্যুৎচমকে, ঘনান্ধকার আকাশের রহস্যে মনে আসে—অনন্তের সে বেণুগীত।

মানুষের চিন্তা বড় পঙ্গু, তার শক্তি নেই সেখানে পৌছায়। নক্ষত্র লোকে যদি কোনো দুঃসাহসিক মানুষ যেতে চায় তবে রেল কি মোটর বাহন নির্দ্দিষ্ট করলে তাকে চলবেনা। তাকে যোগাড় করতে হবে আলোকের রথ—একমাত্র আলোকের গতি তাকে আশ্রয় করতে হবে সেখানে পৌছাতে হ'লে। এমন একটা জিনিষ আছে, যা মনোজগতে আলোর রথের কাজ করে। মনোজগতের সুদূরের বাহন এই জিনিষটা Logic সঙ্গত। শান্ত সুষ্ঠু, ক্রমবদ্ধ, হুঁসিয়ার চিন্তা পদ্ধতি অবলম্বনে সেখানে পৌছাতে তুমি লীলাসম্বরণ ক'রে ফেলবে তবুও হয়তো পৌছাতে পারবে না।

সে জিনিষটা কি তা বোঝানো মুস্কিল, শুধু অনুভব ক'রে আস্বাদ ক'রবার জিনিষ সেটা। Bergson তাকেই Institution ব'লছেন বোধ হয়—আমি ঠিক জানি না।

আমাদের এই দেহটা যেমন এই পৃথিবীর, মৃত্যুটাও তেমনি এই পৃথিবীর। পৃথিবীর দেহটার সম্বন্ধ ঠিক জন্মের মতনই। মৃত্যুটা শাশ্বত জিনিষ নয়, পৃথিবীর সঙ্গেই তার সম্বন্ধ শেষ হ'য়ে গেল। কিন্তু এদের পারে—এই অনিত্য মৃত্যুর পারে, পৃথিবীর পারে এক অনন্ত-জীবন—পৃথিবীর এই মৃত্যু স্পৃষ্ট না হ'য়ে অক্ষুণ্ণ অপরাজিত দাঁড়িয়ে আছে, তা তোমার আমার সকলের। যুগে যুগে চিরদিন এই জ্ঞানটাই শুধু মানুষের দরকার—আর কিছু না। দেশে আজ অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, জল নাই—যাঁরা সে সব দেবার ভার নেবেন বা নিয়েছেন, অত্যন্ত মহৎ তাঁদের উদ্দেশ্য সন্দেহ নাই। তাঁরা তা দিন। কিন্তু তার চেয়েও বড় দান হবে এই জ্ঞানটা—শুধু এই অনন্ত অধিকারের বার্ত্তা মানুষের প্রাণে পৌছিয়ে দেওয়া। দেহের খাদ্য অনেকেই যোগাতে পারে—আত্মার খাদ্য ক'জন যোগায়?

শুধু এই জ্ঞানটা মানুষ মনে প্রাণে যখন বরণ ক'রে নেবে, তার দৈন্য দূর হবে, হীনতা কেটে যাবে, সঙ্কীর্ণতা ধুয়ে মুছে পবিত্র হবে।

কালবৈশাখী শীকরসিক্ত স্নিগ্ধ আশীর্ব্বাদের মত এই অনন্ত অধিকারের বার্ত্তা মানুষের বুভুক্ষু, অজ্ঞানতাদগ্ধ মনে অমৃতের বর্ষণ করুক। দূর অজানা স্বপ্ন-জগতের কোণ থেকে বয়ে আসুক।

মনোজগৎ মানুষের অপূর্ব্ব সম্পদ। একে অবহেলা না ক'রে দুঃসাহসিক আবিষ্কারকের উৎসাহ নিয়ে এক অজানা দেশসমূহে যদি অভিযান করতে বার হওয়া যায়, বিশ্বে বড় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা হবে।

সন্ধ্যা হ'য়ে গিয়েছে। আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি অনেকদূরের আমার

গ্রামের চড়কতলার মেলা থেকে হাসিমুখে ছেলে মেয়েরা মেলা দেখে ফিরে যাচ্ছে—কারুর হাতে বাঁশের বাঁশী, কারুর হাতে মাটীর রং করা ছোরা, মাটীর পাখী।

একদল গেল গাঙ্গুলীপাড়ার দিকে, একদল নতিডাঙ্গার মাঠের পথ বেয়ে ঘেঁটু ও নোনাবনের ধার দিয়ে ছাতিম বনের ছায়ায় ছায়ায় ধুলজুড়ি মাধবপুরের খেয়া ঘাটে যাচ্ছে—পার হ'য়ে ওপারের চাষা গাঁয়ে যাবে। পাঁচ বৎসর আগে যারা ছোট ছিল, এই রকম মেলা দেখে ভেঁপু বাজাতে বাজাতে তেলে ভাজা জিলেপী খেতে খেতে ফিরে গিয়েছিল—তারা এখন মানুষ হ'য়ে অনেক দিন কর্ম্ম-ক্ষেত্রে প্রবেশ ক'রেছে, কেউ খুব নাম ক'রেছে, কেউ কেউ মারা গিয়েছে. কারুর জীবন ব্যর্থতায় দীনতায় ভ'রে গিয়ে বেঁচে থেকেও নেই—আজকার এই নিষ্পাপ, অবোধ, দায়িত্বহীন জীবনকোরকগুলোর পচিশ বৎসরের ভবিষ্যত জীবনের ছবি কল্পনা করতে কড় ভাল লাগে। দিদি, দুর্গা যেন রুক্ষ চুলে হাসিমুখে আঁচলে কদমা বেঁধে নিয়ে মুচকুন্দ-চাঁপার অন্ধকার তলাটা দিয়ে বাড়ী ফিরছে—

—অপু—ওঅপু—তোর জন্যে কত খাবার এনেছি ছাখরে,—ও অপু। পচিশ বৎসরএর পার থেকে ডাক আসে।

॥ ১লা বৈশাখ, ১৩৩৫ সাল ॥

আজকার দিনটি সত্যিই মনে ক'রে রাখবার মত—সেই সকালে আটটার সময় ঘোড়া ক'রে·বার হওয়া গেল। কমলাকুণ্ডু গ্রামের বাড়ী বাড়ী রুগী দেখে বেড়ালাম। কৈস্থুর মেয়ে, বেহারীদের বাড়ী—বেলা প্রায় বারোটার সময় ফিরে এসে গণপৎদের গাঁয়ে গেলাম। সেখানে যাবার সময় বস্তির এদিকে কাশের মাঠটা থেকে পাহাড় বেশ দেখাচ্ছিল! ভাবলাম সব লোকে আমাদের গাঁয়ে নীলপূজোর দিন দুপুরে কাদামাটী দেখতে গিয়েছে—ছাড়ানো ধানগুলো এখনও কাদার ওপরে, ভাল ক'রে গাছ বার হয়নি। ঝম্‌ঝম্ ক'রছে দুপুর—গণপৎদের বাড়ী গিয়ে ওদের বাড়ীর মধ্যে সব ঘুরে ঘুরে দেখা গেল—তারপর দইএর সরবৎ খেয়ে ঠাণ্ডা হলাম। এপারে যুগল শিশি হাতে ক'রে ঔষধ নিতে এল—সব কাজ মিটিয়ে আমি বেরিয়ে এলাম ললিতবাবুর সঙ্গে দেখা ক'রতে ছিরা কাছারীতে। সেখানে তরমুজের সরবৎ ও লুচি ইত্যাদি ললিতবাবু খাওয়ালেন—কিছুতেই ছাড়লেন না। সাড়ে তিনটার সময় সেখান থেকে বেরুলাম—পথে ললিতবাবুর সঙ্গে Eistein সম্বন্ধ কথাবার্ত্তা হ'ল। ঝম্ ঝম্ করছে রদ্দুর—আমরা গেলাম কমলাকুণ্ডু সেই বস্তীটার কাছে তিন সীমানার মীমাংসা

করতে। সেখানে হরিবাবুর তহশীলদারও এল। সেখান থেকে বার হ'য়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলাম—বেলা প'ড়ে গেল—পাহাড়টার দিকে চাইতে চাইতে ভাবছিলাম—গাছটায় দু'একদিন হ'ল চড়কের কাঁটা ভাঙা হ'য়েছে। আজ যদি হঠাৎ যাই তবে সে সব দেখে মনে হবে আবার ছোট হ'য়ে বনগাঁয়েই পড়ি। ক্রমে বেশ রৌদ্র গড়িয়ে বিকেল হ'য়ে গেল। নাড়াবইহারের দিকে সূর্য্যটা লাল হ'য়ে ডুবে যেতে লাগলো। ঘোড়াটা কি চমৎকার ছোটে! কি আরাম! মুক্ত মাঠের মধ্যে হাওয়ায় ওরকম ঘোড়া ছুটিয়ে আসা কি আনন্দের! পথে গণপৎ ঝা ও সহদেব ভকতের সঙ্গে দেখা। ইসমাইলপুর জঙ্গলে একজন কে আগুন দিয়েছে—নাম বললে হংসরাজ—আস্‌রদি আমিন জমি মেপে দিয়েছে বললে। দ্বিরায় যব গম সব কাটা হ'য়ে গিয়েছে—তার পর এসে সেই যে জায়গাটা আমি রোজ ঘোড়া নিয়ে পাহাড় দেখি, সেখানে এলাম। অনেকক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে রইলাম—বড় ভাল লাগল—মুক্ত উদার মাঠ, হু হু নির্ম্মল হাওয়া—দূরবিসর্পিত দিক্‌চক্রবাল—জঙ্গলের খানিকটা খুঁড়ে ফেলেছে। তারই পাশ দিয়ে এসে লোধাইটোলার ঐ পথটা দিয়ে ঘোড়াটা যা ছুটলো! এসে ফিরে স্নান করলাম। দিনটা ভাল লাগল—এগার ঘণ্টা ঘোড়ার ওপর কেটেছে আজ। এত ক্লান্ত কোনো দিন হইনি।

॥ ১৬ই এপ্রিল, ১৯২৮ ॥

আজ বৈকালের দিকে ছোট ঘোড়াটা ক'রে ললিতবাবুর দ্বিরা কাছারী গেলাম। বেশ লাগল—বাইরে টেবিল পেতে ললিতবাবু ও মোহিনীবাবু বসে—হু হু করে পূবে হাওয়া আসছে। সারাদিন গরমের পরে বেশ লাগল। টেলিস্কোপে নক্ষত্রটা দেখে নিলাম। Nion nebula-টাও দেখলাম। তাঁরা Observation-এর জন্যে টেলিস্কোপটা খাটিয়ে রেখে দিয়েছেন। এখন মনে পড়লো ছেলেবেলায় কলকাতা থাকতে দেখেছিলাম, চীৎপুর রেলের ধারে একটা লোক এই রকম টেলিস্কোপ দিয়ে মাপ করছেন—বাবা বললেন, দূরবীণ। না জানি সে লোকটা এখন বেঁচে আছে কি-না। তারপর গল্প-গুজব করবার পর রাত্রি সাড়েন'টার সময় সেখান থেকে বেরুলাম। লোধাইটোলা পর্য্যন্ত একজন আলো দিয়ে পৌঁছে দিয়ে গেল। ভগনি ভগৎ খাতির ক'রে সুপারী ও সিগারেট দিলে। তারপরই অন্ধকার—পথ দেখা যায় না—মাথার ওপর নক্ষত্রভরা আকাশ—নক্ষত্রের আলোয় একটু একটু পথ দেখা যাচ্ছিল। ঘোড়া বেশ ছুটল এক জায়গায়—এমন

Romantic লাগছিল—বালা মণ্ডলের টোলার ওদিকের মেরাক্ষেত থেকে একটা বুনো শুয়োর ঘোঁৎ ঘোঁৎ ক'রে চলে গেল। বামা বৈরিজের বাসাটা ছাড়িয়ে মাঠের মধ্যে প'ড়ে ঘোড়াটা যা ছুটলো—একেবারে জঙ্গল—মাথার ওপরে নক্ষত্রভরা আকাশ। কাছারীতে এসে দেখলাম ললিতবাবু Traverse টেবিলের জন্যে Draftটা পাঠিয়ে দিয়েছেন। মানী ভাগলপুর থেকে এসেছে। টেবিলের উপর গ্লাসের জলে তিনটে বড় ম্যাগনোলিয়া সাজানো।

॥ ১৭ই এপ্রিল, ১৯২৮ ॥

বৈকালের দিকে ঘোড়া নিয়ে বেড়াতে গেলাম। এক দৌড়ে এতটা পথ কোনো ঘোড়াকে আমি যেতে দেখি নি। লোধাইটোলার ওপারের মাঠে অনেক খেড়ীর গাছ গত বৎসরের বীজ থেকে বেরিয়েছে। সেখানে ঘোড়াকে ছেড়ে দিয়ে একটা সিগারেট ধরালাম। তারপর সিগারেটের ধোঁয়া ওড়াতে ওড়াতে ও কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়াটা নাকের সামনের বাতাসে ক্রমে ক্রমে মিশে যাচ্ছে, দেখতে দেখতে ধীর, শান্তভাবে ঘোড়া চালিয়ে লোধাইটোলার খামার দিয়ে নিয়ে এলাম। আজ খুব হাওয়াটা।

॥ ১৮ই এপ্রিল, ১৯২৮ ॥

আজও খেড়ীক্ষেত গিয়ে ঘোড়া ছেড়ে দাঁড়ালাম। পাহাড়টা বড় সুন্দর দেখা যাচ্ছে—আসরফিকে কাল বড় রেগে গিয়ে চাবুক নিয়ে মারতে গিয়েছিলাম। সে আমাকে ক্ষেত দেখিয়ে নিয়ে বেড়ালে।

আজকাল এই অপরাহ্নগুলো যে কি সুন্দর লাগে! প্রতিদিন লেখার কাজ সেরে এই পাহাড়ের এপারে লোধাইটোলায় খেড়ীক্ষেতে ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে দাঁড়াই। আজ অপূর্ব্ব ভাব মনে এল। সেই বোর্ডিং থেকে গ্রীষ্মের ছুটীতে এসে সোঁদালি ফুলভরা ঝোপের তলা দিয়ে সকালবেলা মাঠে বেড়াতে যাওয়া—সেই ওধারের মাঠটা—স্নিগ্ধ নদীজলের গন্ধ—উমা পদ্মফুল দিয়ে শিবপুজো করতো—সেই গ্রামের হাওয়ায় মাঠের রূপে, নদীজলের স্নিগ্ধতায়, ফুলেফুলে আত্মা গড়ে উঠেছিল—কি অপূর্ব্ব আনন্দই এরা জীবনে এনে দিয়েছিল একদিন! আজও সে সব আছে—কিন্তু তাদের যেন ছেড়ে দিয়েছে, আর তারা আমার নয়। শৈশবের সে গ্রাম এখন আমার কাছ থেকে বহুদূর চলে গিয়েছে—সে সব পুরোনো পাখীর ডাক, ফুলফলের সুগন্ধ, স্নেহময় মুখের হাসি স্বপ্ন হয়ে দূর অতীতে

মিশিয়ে গিয়েছে। দশ বৎসর আগে এমন দিনে সকালে উঠে শিয়ালদহে ট্রেনে চড়ে ৬০, মির্জাপুরের কাছে শেষ রাত্রির জ্যোৎস্নায় বিদায় নিয়ে ভোরের বাতাসে কচিপাতা ওঠা বসন্ত দৃশ্যের মধ্যে দিয়ে রওনা হয়েছিলাম। সেই প্রথম বৃষ্টির সোঁদা সোঁদা ভিজা মাটীর গন্ধ—আরও আগেই সেই P. C. Roy-এর ওখানে নেমন্তন্ন, বৃন্দাবন চাকর—দেশে ফিরে Scott-এর বই পড়তাম শুয়ে শুয়ে—জীবনের প্রথম-যাত্রা—বড় মধুর স্বপ্নমাখা সে দিনগুলো—

আমি জানি আমার কাছে যা মধুর বলে মনে হবে অপরের কাছে তার মাধুর্য্য বিশেষ কিছু বোঝা যাবে না—তবু ভবিষ্যতে এই ছত্র কয়টি যদি কেউ পড়ে তবে সে যেন ভুলে না যায় যে জীবনের আনন্দ অতি রহস্যময়—কারো কোনো-দিনের স্মৃতি তুচ্ছ নয়। তারা যেন মনে রাখে ঐসব দিনগুলো এক গ্রাম্য বালককে যে সুখ একদিন দিয়েছিল ছুনিয়ার রাজৈশ্বর্য্য তার কাছে তুচ্ছ।

সন্ধ্যা হয়েছে। বনঝাউগাছের বনের মধ্যে দিয়ে ঘোড়া চালিয়ে ফিরে এলাম। বনঝাউগাছের মাথায় চতুর্থীর চাঁদ উঠেছে। অল্প অল্প মেটে জ্যোৎস্না এখনও ফোটেনি—নির্জ্জন কাশজঙ্গল—বনঝাউগাছ—মাথার ওপরে চাঁদ—দ্রুতগামী ঘোড়া—বেশ লাগে।

॥ ২৪শে এপ্রিল, ১৯২৮ ॥

আজ আমার সাহিত্য-সাধনার একটা সার্থক দিন—এইজন্যে যে আজ আমি আমার দুই বৎসরের পরিশ্রমের ফলস্বরূপ উপন্যাসখানাকে (পথের পাঁচালী) 'বিচিত্রা'তে পাঠিয়ে দিয়েছি।

ঘোড়াকরে বনের মধ্যে দিয়ে বেড়াতে গেলাম। খুব বন—খুব বন—এত বনের পথ আমার জানা ছিল না। সেই বনঝাউএর বনের মাথায় সুন্দর জ্যোৎস্না যখন উঠেছে, তখন ঘোড়া নিয়ে ধীরে ধীরে সোঁদা সোঁদা গন্ধ আঘ্রাণ করতে করতে ঘোড়া চালিয়ে দিয়ে এলাম। সুন্দর—অপূর্ব্ব জ্যোৎস্নায় মনে ভাবছিলাম ভরতদের ঘরে বসতো যে বালকটি, কঞ্চি নিয়ে খেলা করত সে—এসব Egotism ছেড়ে এলাম। তবুও এই ঘোড়া চড়ে জ্যোৎস্না ওঠা জঙ্গলের মৃদু সুঘ্রাণ উপভোগ করতে করতে ঐ কথাটা কেবলই মনে হচ্ছে।

॥ ২৬শে এপ্রিল, ১৯২৮ ॥

॥ শেষ ॥

পরিশিষ্ট ॥ সাহিত্যের কথা

সাহিত্য যদিও সর্বসাধারণের মধ্যে আন্তরিকতম মিলনের যোগসূত্রস্বরূপ, এবং যদিও চারিপাশের মানুষকে বাদ দিয়ে এখানে কোন সৃষ্টি সার্থক হওয়া দূরে থাক প্রায় সম্ভবই নয়,—তবুও সাহিত্য-সৃষ্টি লোকালয়ের হাটের ঠিক মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে করবার নয়। কবি সাহিত্যিক আর্টিস্টদের মধ্যে এক ধরনের সহজাত নিঃসঙ্গতা থাকে। সার্থক রসসৃষ্টি, সাধারণ দৈনন্দিন-জীবনোত্তীর্ণ বৃহৎ আনন্দলোকের আবাহন,—যার জন্য প্রতি শক্তিশালী কবি-মানসেই আত্ম-প্রকাশের প্রেরণাময় এক ধরনের অনির্দেশ্য-ভাবাবেগ তার শ্রেষ্ঠ মুহূর্তগুলিতে সঞ্চারিত হয়, ইহার জন্য আর্টিস্টের প্রয়োজন আপন 'আইডিয়া'র আবহাওয়ায় যত বেশীক্ষণ সম্ভব এবং যত গভীরতমরূপে সম্ভব বাস করা। দুঃখবেদনা, হাসি অশ্রু, সমস্যা-বিজড়িত অপরূপ মানুষের জীবন এবং জগৎ তার লেখার মাল-মশলা,—কিন্তু নিরাসক্ত আনন্দে তিনি সৃষ্টি করে চলেন। কবি-সাহিত্যিক আপনার জন্য লেখেন, সে হচ্ছে তার আত্মপ্রকাশ, অস্তিত্বের সেই একমাত্র রূপের মধ্য দিয়ে তিনি আপনাকে উপলব্ধি করেন। কিন্তু একই সঙ্গে তিনি সকলেরই জন্য লেখেন। কারণ তিনি জানেন ভালবাসার আলোকক্ষেপ ব্যতীত দৃষ্টিতে সত্যকারের বর্ণ ফোটে না, প্রেম ও এক ধরনের নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টি ব্যতীত বাস্তব জগৎ এবং মানব-হৃদয়ের গহনতম রহস্য উদ্‌ঘাটিত হওয়ার নয়। আপনাকে প্রতি মুহূর্তে পূর্ণ করে ও প্রতি মুহূর্তে তিনি আপনাকে অতিক্রম করে যান। চারিপাশের মানব-সমাজ সম্বন্ধে তিনি শুধু চিন্তা করেন এই নয়, এর অন্তরতম হৃদয়-স্পন্দনকে তিনি একান্তভাবে অনুভবের চেষ্টা পান,—তাই তো তিনি তার শ্রেষ্ঠ প্রেরণার ক্ষণে যখন কথা বলেন, তখন তাতে সব দেশ সব কালের বিশ্বমানবের কণ্ঠ বাজে, জীবনের মূলতম রহস্যের আবেগ সেখানে একান্তভাবে সঞ্চারিত হয়। সুতরাং সকলেরই সঙ্গে আপনাকে নিরন্তর যুক্ত রেখে তার সাধনা। তবুও, মনের দিক দিয়ে তার পক্ষে চরম একাকীত্ব একটি প্রকাণ্ড সত্য—অপরিহার্য এবং প্রয়োজনীয়ও। 'রিয়্যালিটি'কে বুঝতে হলে, বা বুঝে

তাকে যথাযথ আঁকতে হ'লে তাতে জড়িয়ে গিয়ে আমরা তা পারি না—কর্মকোলাহলের ঠিক মাঝখানে অথবা লোকলোচনের অত্যন্ত স্পষ্ট পাদপ্রদীপের সামনে অনুক্ষণ থেকে আমরা তা পারি না।

সাহিত্যের কী মূল্য। ঘন এক টুকরো কবিতা, অনবদ্য একটি ছোট গল্প, নিবিড়রেশময় একটি 'লিরিক' ঠাসবুনোট একখানি উপন্যাস, বিপুলতম যার ব্যঞ্জনা, যেখানে বাস্তব জীবননাট্যের বিচিত্র কলকোলাহল, উদ্বোজনা ধ্বনিত হয়েছে,—আমাদের জীবনে এ সবের জন্যে বিশেষ স্থান নির্দিষ্ট. করে রাখা কি এতই দরকার? উত্তর হচ্ছে, দরকার,— অত্যন্ত বেশী দরকার আরো এই জন্যে যে, এইসব প্রশ্ন এখনো আদৌ ওঠে। তেল-নুন-লক্ড়ির কারবার করতে করতে আমাদের অনেকেরই দিন আসে মিলিয়ে। বাঁধা রাস্তায় আমরা জন্মাই এবং মরি—দু-পাশের এই দুই চরম পরিচ্ছেদের মাঝখানের রাস্তাটায় আমরা অনেকেই যে ভাবে চলি, তাতে যেন আমাদের স্রষ্টাকেই ব্যঙ্গ করা হয়। সাহিত্য তাই আমাদের এই অতি-অভ্যাসে বন্ধ ঝিমিয়ে-আসা মনের পক্ষে আকাশ-স্বরূপ, দিগন্ত এখানে অত্যন্ত বিস্তৃত, আবহাওয়া সর্বদাই উজ্জ্বল, অজস্র খোলা জানলা দিয়ে অদৃশ্য কেন্দ্র থেকে প্রতিক্ষণে দিব্য যৌবনময় আলো আর চেতনা এসে ঝরে ঝরে পড়ে। এখানে জীবন অহরহ আপনাকে অত্যন্ত ঘন সুরে বিকরিত করে। জীবনের এই অতি-বিরাট পটভূমিকার জগতে এসে পাঠক এক মুহূর্তে আপনাকে বড করে যায়। দৈনন্দিন জীবনের পারিপার্শ্বিকতার সহস্র ক্ষুদ্রতা ক্লেদ গ্লানি পিছনে পড়ে থাকে,—মানুষ খাণিকক্ষণের জন্য অন্ততঃ খণ্ড-কাল ও দেশের অতীত এক জ্যোতির্ময় চেতনাস্তরের মধ্য দিয়ে অববাহিত হয়ে আসে। প্রত্যেকের আত্মসত্তার এই যে বিস্তারের সম্ভাবনা, কাব্য ও সাহিত্য, তথা আর্টের অন্যান্য বিভাগ, এতে প্রত্যেককে অত্যন্ত প্রত্যক্ষরূপে সহায়তা করে।

সাহিত্য আরো অনেক কিছু করে। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই কম-বেশী পরিমাণে একটি মানুষ আছে, যে নাকি স্বপ্ন দেখে, যে নাকি অন্ততঃ কোন কোন ক্ষণের জন্যেও আদর্শবাদের তীব্র প্রেরণা অনুভব করে, যে অতীত স্মৃতির অনুধ্যানে সহসা উন্মনা হয়, ভবিষ্যতের কল্পনায় নেশার মতন হয় আসক্ত,—রস-সাহিত্যের একটি প্রধানতম কাজ হচ্ছে, প্রত্যেকের ভেতরকার এই স্বপ্নালু লোকটির তৃপ্তিবিধান করা। তা ছাড়া,—কথা-সাহিত্যিক সমসাময়িক সমাজ বা রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দেশকালান্তরিত

জীবনের ছবি আঁকেন। তাতে করে, আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে যে মানুষটি তার নিজ যুগের মানুষ আর ঘটনাবলী সম্বন্ধে খুব উৎসুক, তার কৌতূহল মেটে। সাহিত্য আমাদের কল্পনা ও অনুভববৃত্তিকে উজ্জীবীত করে। এর মননশীল দিক প্রধানতঃ জীবন-সংগ্রামে ও সভ্যতার সংগঠনে আমাদের শক্তি যোগায়, এবং রস-সাহিত্যের সাধনা হচ্ছে অবিচ্ছিন্নভাবে সে আনন্দের রূপীকরণ ও পরিবেশন, যে মূল লীলার আনন্দের প্রেরণায় জীবনের হ'ল উৎপত্তি,—সুখদুঃখ হর্ষবেদনা প্রেমকীর্তি ক্ষয়মৃত্যু সব ব্যাপি এবং সব ছাড়িয়ে যে নৈর্ব্যক্তিক আনন্দ-সত্তা জীবনের সঙ্গে সমান্তরালভাবে প্রতিক্ষণে আপনাকে প্রবাহিত করে চলেছেন, একটু একটু করে মেলে ধরছেন। কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পী যত কথা বলেন, তার মর্ম এই যে, আমাদের ধরণী ভারী সুন্দর—একে বিচিত্র বললেই বা এর কতটুকু বোঝান হল! আমাদের এই দৃষ্টিটি বারে বারে ঝাপসা হয়ে আসে, প্রকৃতির বাইরেকার কাঠমোটাকে দেখে আমরা বারে বারে তাকে রিয়্যালিটি বলে ভুল করি, জীবন-নদীতে অন্ধ গতানুগতিকতার শেওলাদাম জমে, তখন আর স্রোত চলে না; তাই তো কবিকে, রসস্রষ্টাকে আমাদের বার বার দরকার—শুকনো মিথ্যা-বাস্তবের পাক থেকে আমাদের উদ্ধার করতে।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে বলা যেতে পারে যে, সাহিত্য ও শিল্পকে সর্বসাধারণের উপযুক্ত করে দাও—এই একটি আধুনিক ধুয়ার কোন মানে হয় না। এ কথার অর্থ তো এই যে, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের রস অত্যন্ত ঘন, একে খানিকটা জোলো করে দাও,—এর শিল্পের বুননীতে অত সুক্ষ্ম তন্তুর বদলে মোটা দড়ির ব্যবহার প্রচলিত কর। কারণ, তা হ'লে তখন শিক্ষা ও শক্তি নির্বিশেষে এ সাহিত্য যাবতীয় জনের হয়ে উঠবে, রসের মন্দিরে ভিড়ের আর কমতি থাকবে না। আমাদের বক্তব্য এই যে, এ রকম কোন আদেশের উপর যদি জোর দেওয়া হয়, তবে সাহিত্যের সর্বনাশ করা হবে, এবং যাদের দিকে চেয়ে সাহিত্যে এই ভুয়ো গণ-তন্ত্রের সুর আমদানীর জন্য আমরা এ করতে যাব, তাদেরও শেষ পর্যন্ত উপকার কিছু হবে না। রস-সাহিত্যের উপভোগ-সামর্থ্যের দিক দিয়ে যারা 'হরিজন' সাহিত্যকেও জোর করে 'হরিজন'-মার্কা করে তাদের স্তরে না নামিয়ে উক্তরূপে তথাকথিত 'হরিজন'দের আর্ট ও সংস্কৃতিগত শিক্ষার এমন সুযোগ ও সাহায্য দিতে হবে, যাতে করে তারা মনের দিক দিয়ে ক্রমশঃ উঠে আসতে পারে, সুক্ষ্মতম রসের স্বাদ-গ্রহণে পারগ হয়। যেমন ধর্মের ক্ষেত্রে, তেমনি এ ক্ষেত্রেও অধিকার মানতে হয়। বাস্তবিক পক্ষেও আমরা দেখতে পাই যে, চিন্তামূলক

বা সৌন্দর্যমূলক সত্য, ইন্দ্রিয়জয় অতীন্দ্রিয় রসের আবেদন, অথবা একই শ্রেষ্ঠ কাব্য উপন্যাস বা নাটক, জন্মগত ক্ষমতা তখন অনুশীলনবৃত্তির চর্চাভেদে বিভিন্ন পাঠকের মনে—প্রধানতঃ 'ইনটেনসিটি'র দিক দিয়ে—বিভিন্ন রকমের সাড়া জাগায়। সুতরাং আমাদের কর্তব্য হচ্ছে, সাহিত্যের যে একটি স্বাভাবিক আভিজাত্য আছে, এমন কিছু না করা যাতে তা একটুকু ক্ষুণ্ণ হয়, পরন্তু আমাদের সবাইকে তার উপযুক্ত হতে শিক্ষিত করা।

দুদিন বা দশদিন পরে কেউ আমার বই পড়বে না, এ ভয় কোনো সত্যিকার কথা-সাহিত্যিক করেন না। করেন তারা, যারা একটা মিথ্যা ভবিষ্যতের ধূম্র-লোকে নিজদের চিরপ্রতিষ্ঠ দেখতে গিয়ে বর্তমানের দাবীকে অস্বীকার করেন। কেউ বাঁচে নি, বড় বড় নামওয়ালা কথা-সাহিত্যিক তলিয়ে গিয়েছেন কালের ঘূর্ণিপাকের তলায়—সেই যুগের প্রয়োজন শেষ হয়ে গেলে পরবর্তী যুগের লোকের ধুলো ঝেড়ে ছেঁড়া-পাতাগুলো উদ্ধার করবার কষ্টও স্বীকার করে না। দু' দশজন সাহিত্য-রসিক, দু পাঁচজন পণ্ডিত, দু একজন বৈদগ্ধ্যগর্বী মানুষ ছাড়া আজকালকার যুগে কথাসরিৎসাগর কে পড়ে, গোটা অখণ্ড আরব্য উপন্যাস কে পড়ে, ডন কুইকসোট কে পড়ে ? চসার, দান্তে মিল্টন, এ'দের কথা বাদ দিই—ছাত্র বা অধ্যাপক ছাড়া কেউ এ'দের পাতা ওল্টায় না—সকলে তো কাব্যপ্রিয় নয়—কিন্তু অত বড় যে নামজাদা ঔপন্যাসিক বালজাক তাঁর উপন্যাস-রাশির মধ্যে কখানা আজকাল লোকে সখ করে পড়ে ? স্কট, হেনরি জেম্স, থ্যাকারে, ডিকেন্স সম্বন্ধেও অবিকল এই কথা খাটে। ফিল্মে না উঠলে অনেকের অনেক উপন্যাস কি নিয়ে লেখা তাই লোকে জানত না। মানটাই থেকে যায় লেখকের, তাঁর রচনা আধমরা অবস্থায় থাকে; অনেক ক্ষেত্রেই মরে ভূত হয়ে যায়।

জানি, একথা আমাদের স্বীকার করতে মনে বড় বাধে। খোলাখুলিভাবে বললে আমরা এতে ঘোর আপত্তি করি—'বিশ্ব', 'অমর', 'শাশ্বত, প্রভৃতি বড় বড় গাল-ভরা কথা জুড়ে জুড়ে দীর্ঘ ছাঁদে সেণ্টেন্স রচনা করে তার প্রতিবাদ করি। কিন্তু আমরা মনে মনে আসল কথাটি সকলেই জানি।

যে সাহিত্য টবের ফুল—দেশের সত্যিকার মাটিতে শিকড় চালিয়ে যা রস-সঞ্চয় করছে না, দেশের লক্ষ লক্ষ মুক নরনারীর আশা-অকাঙ্ক্ষা, দুঃখ বেদনা যাতে বাণী খুঁজে পেলে না, তা হয় রক্তহীন, পাণ্ডুর, থাইসিসের রোগীর মত জীবনের বরে বঞ্চিত, নয়তো সংসার বিরাগী, ঊর্দ্ধবাহু, মৌনী, যোগীর মত সাধারণ

সাংসারিক জীবনান্তে বাইরে অবস্থিত। মানুষের মনের যা, সমাজের চিত্র হিসেবে তা নিতান্তই মূল্যহীন।

পূর্বেই বলেছি, মিথ্যাকে আশ্রয় করেও কথা-সাহিত্যিক রসসৃষ্টি করতে পারেন। কিন্তু সে হয় মানুষকে ক্ষণকালের জন্য ভুলিয়ে রাখবার সাহিত্য—সমাজের ও জীবনের সত্য চিত্র হিসেবে তার মূল্য কিছু থাকে না।

গভীর রহস্যময় এই মানব-জীবন। এর সকল বাস্তবতাকে এক বহুবিচিত্র সম্ভাব্যতাকে রূপ নেওয়ার ভার নিতে হবে কথাশিল্পীকে। তাকে বাস করতে হবে সেখানে, মানুষের হট্টগোল, কলকোলাহল যেখানে বেশী, মানুষের সঙ্গে মিশতে হবে, তাদের সুখদুঃখকে বুঝতে হবে, যে বাড়ীর পাশের প্রতিবেশীর সত্যিকার জীবন-চিত্র লিখেছে, সে সকল যুগের সকল মানুষের চিত্রই এঁকেছে—চাই কেবল মানুষের প্রতি সহানুভূতি, তাকে বুঝবার ধৈর্য। ফ্লবেয়ার বলেছে, মানুষে যা করে, যা কিছু ভাবে, সবই সাহিত্যের উপাদান, তাই তাকে লিখতে হবে, শোভনতার খাতিরে তিনি যদি জীবনের কোন ঘটনাকে বাদ দেন, চরিত্রের কোন দিক ঢেকে রেখে অঙ্কিত চরিত্রকে মাধুর্য-মণ্ডিত বা শ্রেষ্ঠ করবার চেষ্টা করেন—ছবি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে!

'এমা বোভারি'র স্রষ্টার উপযুক্ত কথা বটে!

কিন্তু এই বাস্তবতার কি একটা সীমা নেই? জীবনের নগ্ন চিত্র—দিগ্বসনা ভীমা ভয়ঙ্করী ভৈরবীর মত করাল—সে চিত্র মানুষের মনে ভয়-সঞ্চার করে, অবসাদ আনে, জুগুপ্সার উদ্রেক করে—সাধারণ রসবিলাসী পাঠকের সাধ্য নয় সে কঠিন নিষ্ঠুর সত্যের সম্মুখীন হওয়া। সূর্যের অনাবৃত তাপ পৃথিবীর মানুষে সহ্য করতে পারে না, তাই বহুমাইলব্যাপী বায়ুমণ্ডলের আবরণের মধ্য দিয়ে তা পরিস্রুত হয়ে, মোলায়েম হযে তবে আমাদের গৃহ-অঙ্গনে পতিত হয় বলে রৌদ্র আমাদের উপভোগ্য, প্রাণীকুলের উপজীব্য।

সে আবরণ দেবেন শিল্পী তার রচনায়। নির্বাচনের স্বাধীনতা তিনি ব্যবহার করবেন শিল্পীর সংযম ও দৃষ্টি নিয়ে।

সাহিত্য-সংশ্লিষ্ট আর দু একটি মাত্র কথা বলে আমি শেষ করব। সাহিত্যে প্রোপাগাণ্ডার স্থান সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলেছেন। আমাদের বক্তব্য এই যে, সমাজ-সংস্কারই হোক, দেশপ্রেমই হোক, অথবা অন্য কোন সমস্যাদি সম্বন্ধে মতবাদই হোক, সব কিছুরই প্রোপাগাণ্ডা সাহিত্যের মধ্য দিয়ে একটা বিশেষ সীমার ভেতরে থেকে করা যেতে পারে, যদি তা তারপরও

সাহিত্যই থাকে, কোন প্রচার-বিভাগের বিশদ চিত্তাকর্ষক প্যাম্ফ্লেটের মতন না হয়ে ওঠে। সাহিত্য ও আর্টের জাত নষ্ট হয় তখনি, যখন এ অপরতর কোন উদ্দেশ্য সাধতে গিয়ে আপনার মূল সাধনা—অর্থাৎ সমসাময়িক সমস্যারও অতীত শাশ্বত সৌন্দর্য-সৃষ্টির প্রেরণা থেকে বিচ্যুত হয়। মনে রাখতে হবে স্বধর্ম ত্যাগ করা ভয়াবহ—অনেক কিছুর মত এক্ষেত্রেও। তারপর আমরা আনতে পারি—সাহিত্যের সঙ্গে নীতি ও কল্যাণবুদ্ধির সম্পর্কের কথা। সাহিত্যে সুনীতি দুর্নীতি, শ্লীলতা অশ্লীলতা ইত্যাদি নিয়ে প্রত্যেক দেশের সাহিত্যের ইতিহাসেই অনেক ঝড় বয়ে গিয়েছে। শ্লীলতা ও অশ্লীতা সম্বন্ধে আমরা এই বলতে পারি যে, বাইরের পৃথিবী এবং মানুষের জটিল জীবন-কাহিনী তাদের অন্তর্নিহিত রসরূপে তখনই আমাদের অভিভূত করতে পারে, যখন আমরা এদের একই সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে এবং ইন্দ্রিয়াতীতরূপে আমাদের মানস চেতনায় পাই। এইজন্য আদিরসও যখন মধুর রসে পরিণত হয়, তখন তা হয় আর্ট। কামজ প্রেমের কথা বলতে গিয়েও কবি যখন নিরাসক্ত কুতুহলে অতীন্দ্রিয় ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করে চলেন, তখনই তা হয় আর্ট। তখন তা আর শ্লীলও থাকে না, অশ্লীলও নয়। সঙ্কীর্ণ অর্থে নৈতিকতার মানদণ্ড সাহিত্যের প্রতি প্রয়োগ করা যায় না অবশ্য, কিন্তু যে বৃহৎ কল্যাণবুদ্ধি আমাদের সকলের স্রষ্টার মনে তার জগৎসৃষ্টির বেলায় ছিল বলে আমরা কল্পনা করি, রস-স্রষ্টাকে ধ্যাননেত্রে তাকে পেতে চেষ্টা করা প্রয়োজন। কারণ, কি জীবনে, কি সাহিত্যে—শক্তি ও প্রতিভার সঙ্গে প্রেম ও সত্যবুদ্ধি যুক্ত না হ'লে স্থায়ী কিছুর প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় না। সমাজের প্রচলিত নীতি-প্রথাকে সাহিত্যিক নির্মম আঘাত করতে পারেন, কিন্তু শুধু সত্যের জন্যই পারেন, ব্যক্তিগত খেয়াল চরিতার্থ করবার জন্য নয়। সাহিত্যিক বাস্তব জগতের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে তার চিত্র আঁকবেন। কিন্তু তাঁর অন্তর্দৃষ্টি যথেষ্ট পরিষ্কার হ'লে তিনি দেখবেন যে বাইরের জগতে যা ঘটে, তার চেয়ে লেখকের মনের জগতে আর এক মহত্তর ব্যঞ্জনাময় বাস্তব আছে ; এবং, যদিও মানুষের জীবন এত বিচিত্র ও মোহনীয়রূপে জটিল, কারণ পাপ দুর্বলতা পদস্খলনের কাহিনী তার পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক, তবুও সে যেখানে বড়, সেখানে তার রূপ কেবল এইই নয়। তা ছাড়া, বৃহত্তর অর্থে নীতিবোধ, জীবন সমাজের মূল সত্তার সঙ্গে জড়িত ; সাহিত্য থেকে তাকে কি আমরা বিচ্ছিন্ন করতে পারি !

মাঝে মাঝে একটা কথা শোনা যায় যে, আমাদের মত পরাধীন দরিদ্র দেশের সঙ্কীর্ণ সমাজের মধ্যে কথা-সাহিত্যের উপাদান তেমন মেলে না। "আমাদের

দেশে কি আছে মশাই, যে এ নিয়ে নতুন কিছু লেখা যাবে, সেই থাড়া বড়ি থোড়”
—একথা অনেক বিজ্ঞ পরামর্শদাতার মুখে শোনা যায়।

এই ধরনের উক্তির সত্যকার বিচার করতে বসলে দেখা যায়—এসব কথা মাত্র আংশিকভাবে সত্য। বাংলাদেশের সাহিত্যের উপাদান বাংলার নরনারী, তাদের দুঃখদারিদ্র্যময় জীবন, তাদের আশা-নিরাশা, হাসি-কান্না-পুলক—বহির্জগতের সঙ্গে তাদের রচিত ক্ষুদ্র জগতগুলির ঘাত-প্রতিঘাত, বাংলার ঋতুচক্র, বাংলার সন্ধ্যা-সকাল, আকাশ-বাতাস, ফলফুল—বাঁশবনের, আমবাগানের নিভৃত ছায়ায় ঝরা সজ্‌নে ফুলবিছানো পথের ধারে যে সব জীবন অখ্যাতির আড়ালে আত্মগোপন করে আছে—তাদের কথাই বলতে হবে, তাদের সে গোপন সুখদুঃখকে রূপ দিতে হবে।